□ প্রথম প্রকাশ : অগ্রায়ণ ১৩৬৭ / নভেম্বর ১৯৬০

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায়

বীথিকা ভট্টাচার্যকে

মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্' নাটক ভিত্তি করেই এই কাহিনীর বিন্যাস। মহাকবির এই নাটক মিলনান্তক। কিন্তু কাহিনীর পরিণতিতে আমি ঋক্‌বেদকে অনুসরণ করেছি। সুতরাং এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ ভাবে 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্' অনুসারী একথা বলবো না। এছাড়া ব্রহ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও মহাভারত থেকেও কিছু ভাবনা গ্রহণ করেছি। চেষ্টা করেছি স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশী ও মর্তবাসী রাজা পুরূরবার প্রেম-কাহিনীকে রূপ দিতে—যে প্রেম শাশ্বত ও চিরকালীন।

'আমাদের প্রিয়সখি উর্বশী আর চিত্রলেখাকে দেববিদ্বেষী দুরন্ত কেশীদৈত্য হরণ করে নিয়ে গেছে, কাছাকাছি স্বর্গের সুহৃদ কোনো বীর যদি থাকেন, তা হলে দয়া করে আমাদের প্রিয় সখিদ্বয়কে দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করুন।'

নারীকণ্ঠের আর্ত-আবেদন শুধু নয়, সেই সঙ্গে ক্রন্দনের ধ্বনিও ভেসে আসছে।

উষালগ্নে সৌরলোক থেকে সূর্যবন্দনা সমাপন করে আপন রাজকীয় আকাশরথে রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগরীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজর্ষি পুরূরবা।

অকস্মাৎ রাজর্ষি শুনতে পেলেন আকাশপথে ভেসে আসছে মিলিত নারীকণ্ঠের আর্ত-ক্রন্দনের ধ্বনি এবং আকুল আবেদন।

বিচলিত হলেন রাজর্ষি। এই আকাশপথে কারা এমন আর্তনাদ করছে! নিশ্চয়ই উর্বশী চিত্রলেখার সঙ্গিনী অপ্সরাগণ।

সারথি ততক্ষণে রথের গতি কিছুটা মন্থর করেছে।

ঈশান দিক থেকে আসছে আর্ত ক্রন্দনের ধ্বনি। রাজা পুরূরবা সারথিকে নির্দেশ দিলেন, দ্রুত ঈশান দিকে রথ চালনা করতে।

রথের গতিপথ পরিবর্তন করলো সারথি।

বায়ুর গতিতে রাজকীয় রথ ছুটে চললো মেঘদাম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। রাজর্ষি পুরূরবা এখন ধনুর্বাণ হাতে রথাগ্রে দণ্ডায়মান।

রাজর্ষি পুরূরবার কাছে সুরসুন্দরী উর্বশীর কথা অজানা নয়। স্বর্গলোকের অপ্সরাদের মধ্যমণি উর্বশী। যার সৌন্দর্যের কাছে স্বর্গমর্তের সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। এমন কি রূপগর্বিতা লক্ষ্মীও তার পাশে দাঁড়াতে পারেন না। তবে উর্বশীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য তাঁর আজও হয়নি।

কিছু পথ এসেই ক্রন্দনরতা রম্ভা মেনকা ও আরো কয়েকজন পুষ্পসাজে সজ্জিতা অপ্সরাকে দেখতে পেলেন পুরূরবা। রাজর্ষিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাগণ এগিয়ে এলো।

রাজর্ষি পুরূরবা কোনোরকম ভূমিকা না করে রাজোচিত ভঙ্গিতে আপন

পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মর্তবাসী রাজা পুরূরবা, সৌরলোক থেকে সূর্য-বন্দনা করে রাজধানী ফিরছিলাম, আকাশপথ থেকে শুনতে পেয়েছি তোমাদের আকুল আহ্বান আর ক্রন্দনের ধ্বনি।

অপ্সরাবৃন্দ নত মস্তকে অভিনন্দন জানালো রাজর্ষিকে।

পুরূরবা জিজ্ঞাসা করলেন, বলো কোন পথে তোমাদের সখিদ্বয়কে নিয়ে গেছে দৈত্য ?

রম্ভা ঈশান দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।

পুরূরবা জানতে চাইলেন, দৈত্য হঠাৎ তোমাদের দুই সখিকে অপহরণ করলো কেন ?

রম্ভা বললে, দেবলোকের প্রতি দৈত্যদের ঈর্ষার কথা তো জানেন। তাছাড়া উর্বশীকে কে না কামনা করে।

পুরূরবা বললেন, কিন্তু তোমরা এখানে এসেছিলে কেন ?

রম্ভা বললে, রাত্রে আমরা কুবেরের রাজধানী অলকাপুরীতে গিয়েছিলাম নৃত্যগীত পরিবেশন করতে। সারারাত মহারাজ কুবেরের নাটশালায় নৃত্যগীত পরিবেশন করে আমরা ইন্দ্রলোকে ফিরে যাচ্ছিলাম আকাশ পথে ; হঠাৎ দেববিদ্বেষী কেশী আমাদের পথ রোধ করলো। আমরা তো অপ্সরা মাত্র, কি আর করবো। যুদ্ধবিদ্যা তো আমাদের জানা নেই। আমাদের চোখের সামনে উর্বশী আর চিত্রলেখাকে নিয়ে গেল। জানি না তাদের ভাগ্যে এতক্ষণ কী অঘটন না ঘটেছে। আপনি বীর—দয়া করে উদ্ধার করুন আমাদের প্রিয় সখিদের।

পুরূরবা অভয় দিলেন, তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি পুরূরবা কথা দিচ্ছি, তোমাদের প্রিয়সখি উর্বশী আর চিত্রলেখাকে দৈত্যের কবল থেকে উদ্ধার করে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো। এখন বলো, তোমরা কি এখানেই অপেক্ষা করবে ?

—না, রম্ভা বললে, আমরা হেমকূট পর্বতের শিখরদেশে রাজর্ষির প্রতীক্ষায় থাকবো।

—ঠিক আছে। আমি এখন চললাম। পুরূরবা বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আমি অচিরেই তোমাদের সখিদ্বয়কে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবো।

—রাজর্ষির জয় হোক। মেনকা বললে, সত্যিই আপনি চন্দ্রবংশের যোগ্য উত্তরপুরুষ।

পুরূরবার রথ ততক্ষণে ঈশান দিকে ধাবিত হয়েছে। মেনকার প্রশস্তি বাক্য রাজর্ষির কানে যায়নি।

রম্ভা, মেনকা ও অন্যান্য অপ্সরাগণও হেমকূট পর্বত-শিখরের উদ্দেশে আকাশপথে যাত্রা করলো।

হেমকূট পর্বত-শিখরে অবতরণের পর রম্ভা বললে, আমার কিন্তু ভয় করছে সখি মেনকা।

—কিসের ভয়? মেনকা জিজ্ঞাসা করলো।

—যে কেশী দৈত্যের ভয়ে দেবকুল সদাশংকিত, মর্তবাসী রাজা পারবেন তো সেই শক্তিধর দৈত্যের হাত থেকে উর্বশীও চিত্রলেখাকে উদ্ধার করতে!

মেনকার দৃষ্টি তখন ঈশান দিকে, যেখানে ঘন মেঘদাম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভয়ঙ্কর শব্দ সৃষ্টি করে পুরূরবার রথ ছুটে চলেছে ঝটিকার গতিতে। মেনকা আকাশপথে চোখ রেখে বললে, জানিস রম্ভা, যে রথ আমরা দেখছি, ওই রথ চন্দ্রদেব প্রদত্ত। ওই রথের নাম হলো সোমদত্ত। আর রথের অধিকারী রাজর্ষি পুরূরবার বীরত্বের খ্যাতি স্বর্গ-মর্তে বিদিত। তুই কি জানিস না রম্ভা, কিছুকাল আগে যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র মর্তবাসী রাজা পুরূরবাকে দেবসেনা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর সে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এই মর্তবাসী রাজা। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই!

রাজা পুরূরবার রথ ততক্ষণে দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেছে।

রম্ভা বললে, তোর কথাই যেন সত্যি হয় সখি।

দৈত্যকুলের অন্যতম কেশী। দারুণ দেববিদ্বেষী। বারবার সে স্বর্গলোক আক্রমণ করেছে, কিন্তু আজও কেউ তাকে নিধন করতে পারেনি। তার অনেকদিনের বাসনা উর্বশীকে লাভ করার। অনেকদিন সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যে সুযোগ আজ পেয়েছে।

রাজা পুরূরবা দূর থেকে দেখলেন কেশী সংজ্ঞাহীনা উর্বশী এবং চিত্রলেখাকে

নিয়ে পর্বতের গুহাপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পুরূরবার রথের শব্দ পেয়ে কেশী একবার পিছনে ফিরে তাকিয়েছিল মাত্র।

রথ থেকে অবতরণ করেই পুরূরবা ধনুকে বাণ যোজনা করে কেশীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন। অব্যর্থ নিশানা তাঁর তীরের। কেশীর বিশালাকার শরীর ভূলুণ্ঠিত হলো। প্রতি আক্রমণ করার সুযোগ পেল না কেশী। পর পর আরো কয়েকটি বাণ নিক্ষেপ করলেন পুরূরবা। কেশীর রক্তাক্ত শরীর কয়েকবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। সংজ্ঞাহীনা উর্বশীর দেহ তখন একটি পাথরের ওপর, তার পাশেই দাঁড়িয়ে সুন্দরী চিত্রলেখা।

পুরূরবা দ্রুত এগিয়ে গেলেন। একবার দৃষ্টিপাত করলেন সংজ্ঞাহীনা উর্বশীর দিকে, তারপর চিত্রলেখাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভয় নেই, তুমি তোমার সখিকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে আমার রথে আরোহন করতে পারো।

চিত্রলেখা ফিরে তাকালো পুরূরবার মুখের দিকে। দেবনিন্দিত অবয়ব, অথচ দেবতা নয়—তবে এই উদ্ধার কর্তা কে!

পুরূরবা বোধহয় চিত্রলেখার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বললেন, আমি মর্তবাসী রাজা পুরূরবা।

—রাজর্ষি পুরূরবা! চিত্রলেখা বললে, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন রাজর্ষি। আপনার কথা শুনেছি তবে চোখে দেখার সৌভাগ্য আজই হলো। আপনি যে আমাদের রক্ষা করেছেন, তার জন্যে কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো—ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

পুরূরবা মৃদু হাসি মিশিয়ে বললেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। যে দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপা তোমাদের সতত রক্ষা করে, আজও সেই ইন্দ্রের আশীর্বাদে তোমরা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছো। থাক, এখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়, এই পর্বত দৈত্য অধ্যুষিত—যে কোনো মুহূর্তে তারা আক্রমণ করতে পারে। তুমি তোমার সখিকে নিয়ে রথে আরোহন করো। তোমাদের সঙ্গিনীরা হেমকূট পর্বত শিখরে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

চিত্রলেখা এবারে উর্বশীর কাছে গেল। বারবার ডাকলো নাম ধরে। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এবারে চিত্রলেখা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো পুরূরবার মুখের দিকে।

পুরূরবা বললেন, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

চিত্রলেখা বললে, দেখি সখির কোমল দেহের ভার আমি বহন করতে পারি কিনা।

উর্বশীকে দুহাতে তুলে নিয়ে রথে আরোহন করলো চিত্রলেখা। কিন্তু উর্বশী তখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

পুরূরবাও রথে উঠে এসেছেন। সারথি এখন নির্দেশের অপেক্ষায়।

পুরূরবা বললেন, চলো—হেমকূট পর্বতশিখরে।

চিত্রলেখা এবারে সখি উর্বশীর মুখের কাছে মুখ রেখে বারবার বলতে লাগলো, 'সখি উর্বশী তুই চোখ মেলে চেয়ে ছাখ, আর আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা এখন আর দৈত্যের হাতে বন্দিনী নই।' কিন্তু কোনো কথাই উর্বশীর কানে যাচ্ছে না। তার মূর্ছা ভাঙার কোনো লক্ষণই নেই।

পুরূরবার দৃষ্টি এখন উর্বশীকে স্পর্শ করে আছে। পুরূরবা দেখছেন, মূর্ছিতা উর্বশীর স্বর্ণলতার মতো কোমলতনু লুটিয়ে আছে চিত্রলেখার কোলের কাছে। তার কুঞ্চিত রেশম-কোমল দীর্ঘ কেশরাশ ময়ূরের পেখমের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু কিছু চূর্ণ কুন্তল স্বেদসিক্ত ললাটদেশে লিপ্ত হয়ে আছে। ললাট দেশের কুঙ্কুম বিন্দুটি স্থান ভ্রষ্ট হয়েছে। শাড়ির আঁচল ছিন্নভিন্ন, কটি দেশ থেকে বস্ত্রাবরণ সরে গেছে। রত্ন মেখলাও যথাস্থানে নেই। কাঁচলি বন্ধনমুক্ত বক্ষদেশ। শুধু পীনপয়োধর যুগলের মাঝখানে কণ্ঠের মন্দার-মালিকাটি বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে। বক্ষদেশের ওপর কয়েকটি রক্তিমরেখা—দৈত্যের পীড়নের চিহ্ন। নয়নদ্বয় এখনো মুদ্রিত—মনে হয় স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকলি প্রভাতের সূর্যকিরণের স্পর্শের অপেক্ষায় রয়েছে। চরণ যুগলের অলক্তরাগ এখনো এতটুকু ম্লান হয়নি। নর্তকী উর্বশীর রজতমঞ্জীর যেন অলক্তরাগকে লজ্জা দিচ্ছে।

পুরূরবা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অনন্তযৌবনা উর্বশীর কোমল তনুর প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করছেন। চিত্রলেখার দৃষ্টি মাঝে মাঝে পুরূরবার ওপর এসে পড়ছে। চিত্রলেখা বুঝতে পারছে রাজর্ষির হৃদয়ে এখন মদনদেবের লীলাখেলা চলেছে।

সত্যিই, পুরূরবা অনুপমা উর্বশীকে দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, উর্বশীকে দেখা যেন এক দুর্লভ সৌভাগ্য। মনে মনে কেশী

দৈত্যের কথাও ভাবলেন, যদি আজ কেশী দৈত্য এই সুরসুন্দরীকে হরণ না করতো, তাহলে এই সুন্দর মুহূর্তগুলি জীবনে দেখা দিত না।

পুরূরবা আরো ভাবছেন নারায়ণের কী অনুপম সৃষ্টি এই জ্যোতির্ময়ী উর্বশী। সৌন্দর্য-অভিমানিনী স্বর্গনটীদের রূপাভিমান খর্ব করতেই তিনি আপন উরুদেশ থেকে চিরযৌবনা উর্বশীকে সৃষ্টি করেছিলেন। যে উর্বশীর কাছে স্বয়ং নারায়ণীকেও নিষ্প্রভ মনে হয়।

রথ ছুটে চলেছে হেমকূট পর্বতের দিকে। উর্বশী এখনো সংজ্ঞাহীনা।

চিত্রলেখা এবারে হাত রাখলো উর্বশীর বক্ষদেশে। অনুভব করলো হৃদস্পন্দন। তারপর মুখের কাছে ঝুঁকে বলতে লাগলো, ওলো প্রিয়সখী, তুই না অপ্সরা! তুই না দেবকুলের মনোরঞ্জনকারিণী নটী উর্বশী! তোর এত ভয় কেন? দৈত্য তোর অঙ্গ স্পর্শ করেছে—এ আর এমন কি।

তবু উর্বশী কোনো সাড়া দিল না।

পুরূরবা এবারে চিত্রলেখাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার প্রিয় সখির মন থেকে এখনো ভয়ের ছায়া অপসৃত হয়নি। দেখছো না, ওর বুকের ওপর মন্দার মালাটা কেমন কাঁপছে। তবু তোমার সখিকে ভালো করে বুঝিয়ে বলো—কোনো ভয় নেই।

পুরূরবার দিকে তাকালো চিত্রলেখা। মিনতি জানিয়ে বললে, দেখুন না রাজর্ষি, আপনি তো সখিকে দৈত্যের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, এবারে যদি তাকে ভয়মুক্ত করতে পারেন।

পুরূরবা বললেন, কোনো অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে হয়তো তোমার সখির মনে নতুন করে ভয়ের সঞ্চার হতে পারে। আমার মনে হয়, তুমি ওকে আরো অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলো—এখন আর কোনো ভয় নেই। অচিরেই তোমরা ইন্দ্রলোকে গমন করবে।

চিত্রলেখা স্পর্শ করলো উর্বশীর চিবুক। বলতে লাগলো, ওলো উর্বশী একবার চেয়ে দেখ আমরা এখন রাজকীয় আকাশরথে চলেছি। সেই ভয়ংকর দৈত্যকে সংহার করেছেন দেবতা-বান্ধব রাজর্ষি পুরূরবা।

তবু উর্বশীর চেতনা ফিরছে না।

পুরূরবা দেখলেন, উর্বশীর পীন পয়োধরযুগলের ওপর মন্দার-মালিকা

থরথর করে কাঁপছে। নিশ্চয়ই উর্বশী এখনো ভয়মুক্ত হতে পারেনি।

চিত্রলেখা এবারে বিচলিত হলো। আবার সে উর্বশীর নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলো।

এবারে পুরূরবা এগিয়ে গেলেন। কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থেকে বলতে লাগলেন, সুন্দরী—এখনো তোমার মনে কিসের ভয়? ইন্দ্রের আশীর্বাদ তোমাকে আজ রক্ষা করেছে। এবারে তোমার ওই পদ্মনিন্দিত আঁখি উন্মীলিত করো। দেখো, আকাশে এখন এতটুকু মেঘ নেই। কই, একবার অন্তত চোখ মেলে চাও।

যাদুস্পর্শে যেমন রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভেঙে যায়, তেমনি রাজর্ষির কথায় উর্বশীর মন থেকে ভয়ের ছায়াটা দূরে সরে গেল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। চিত্রলেখার মুখের দিকে চেয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, সখি চিত্রলেখা, দেবরাজ কি আমাদের বিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন?

—না সখি। চিত্রলেখা বললে, মর্তবাসী রাজা পুরূরবা আমাদের উদ্ধার করেছেন। এখন আমরা রাজার রথে হেমকূট পর্বতে চলেছি। যেখানে আমাদের প্রিয়সখিরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

—রাজা পুরূরবা! উর্বশীর দৃষ্টি এখন পুরূরবার দিকে। রাজর্ষির সৌম্যকান্তি দর্শনে মুগ্ধ-অভিভূত উর্বশী অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলে, রাজা পুরূরবা!

চিত্রলেখা রাজর্ষির প্রশস্তি করে বললে, দৈত্য সংহার করে রাজর্ষি শুধু আমাদের নয় স্বর্গের মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

চিত্রলেখার কথা কানে যায়নি উর্বশীর, সে তখনো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সৌম্যদর্শন পুরুষপ্রবর রাজা পুরূরবার দিকে। কি সুন্দর অবয়ব, বলিষ্ঠ অথচ কোমল। আর রাজর্ষির আয়ত দুটি চোখে কি গভীর প্রশান্তি।

উর্বশীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো রাজর্ষির। প্রথম দর্শনেই প্রেম। পরস্পরের নয়ন দর্পণে প্রতিফলিত পরস্পরের প্রতিবিম্ব।

উর্বশীর কানের কাছে মুখ রেখে চিত্রলেখা বললে, সখি অমন করে কি দেখছিস?

উর্বশী লাজনম্র কণ্ঠে বললে, দেখতে দে সখি।

চিত্রলেখা চটুল ভঙ্গিতে হাসলো। এবারে ফিরে তাকালো রাজর্ষির মুখের দিকে। সে অনুমান করলো হৃদয় বিনিময়ের পালাটি এর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এবারে উর্বশী উঠে বসলো। চিত্রলেখাকে বাহুবন্ধনে আকৃষ্ট করে বললে, সখি আমাদের আর-আর প্রিয়সখিরা ভালো আছে তো?

চিত্রলেখা বললে, এর মধ্যে এত ভুল, একটু আগেই না বলেছি তারা হেমকূটে পর্বতে অপেক্ষা করছে।

উর্বশী এবারে উঠে দাঁড়ালো। ফিরে তাকালো চারদিকের পটভূমিকায়। আকাশের বুকে কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। নির্মেঘ আকাশ। দূরে দেখা যাচ্ছে হেমকূট পর্বতের শিখরদেশ। সূর্যস্নাত হেমকূট পর্বতের তুষার শৃঙ্গগুলি যেন রজত মুকুট পরিধান করে আছে।

পুরূরবা বললেন, ওগো বরবর্ণিনী, আমরা ওই পর্বত শিখরেই অবতরণ করবো।

হেমকূট পর্বতের শিখর দেশে রাজর্ষির রাজকীয় আকাশরথ অবতরণ করলো। কিন্তু রথ প্রস্তরাকীর্ণ মৃত্তিকা স্পর্শ করার মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল। উর্বশী টাল সামলাতে না পেরে দু হাতে পুরূরবাকে জড়িয়ে ধরলো। উর্বশীর কোমল-তনুর স্পর্শে পুরূরবার শরীর-মন অপূর্ব আনন্দে রোমাঞ্চিত হলো। সুরসুন্দরীর অঙ্গস্পর্শে এত সুখ, এত আনন্দ!

পুরূরবা মুহূর্তে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন।

হেমকূট পর্বতশিখরে অপেক্ষমান অপ্সরাবৃন্দ রাজা পুরূরবার নামে সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে এলো। কিন্তু রথের সামনে এসেই সবাই কেমন চুপ করে গেল। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

চিত্রলেখার অঙ্গুলি স্পর্শে উর্বশী সচকিত হলো। পুরূরবার স্পর্শমুক্ত হয়ে চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর লাজনম্র দৃষ্টিতে তাকালো চিত্রলেখার দিকে।

রাজা পুরূরবা রথের অগ্রভাবে এসে দাঁড়ালেন। রম্ভা, মেনকা ও অন্যান্য অপ্সরাগণের উষ্ণ-অভিনন্দন গ্রহণ করে বললেন, আমি নিমিত্ত মাত্র। ইন্দ্রের আশীর্বাদ তো তোমাদের প্রতি মুহূর্তের রক্ষাকবচ।

এখনো উর্বশী নিজেকে অসহায় বোধ করছে। রথ থেকে নামার শক্তি-টুকুও যেন তার নেই। যতবার পা বাড়াতে যায়, ততবার পিছিয়ে এসে চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরে।

চিত্রলেখা পরিহাসের সুরে বলে, আমি কি রাজর্ষিকে ডাকবো। তিনি হয়তো তোকে রথ থেকে নামতে সাহায্য করতে পারবেন।

উর্বশী বললে, কেন আমার সখি চিত্রলেখা তো আছে।

চিত্রলেখা হাসলো। বললে, আমি তো আছি—কিন্তু আমি তো দৈত্য সংহার করে তোকে উদ্ধার করতে পারিনি। যাক, এখন আমার হাত ধরে রথ থেকে নাম তো—তারপর অন্যকথা।

চিত্রলেখার হাত ধরে উর্বশী নেমে এলো অপ্সরাবৃন্দের মধ্যে। রম্ভা, মেনকা, সহজন্যা ও অন্যান্য অপ্সরাগণ তাদের প্রিয় সখিদ্বয়কে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু এই আনন্দঘন মুহূর্তে উর্বশী কেমন যেন স্থির।

রাজা পুরূরবা এখন স্থিরমূর্তির মতো রথের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁর দুটি চোখ উর্বশীকে স্পর্শ করে আছে।

পুরূরবা ভাবছেন, আজ তাঁর সূর্যবন্দনা সার্থক। জীবনে এমন সুন্দর দিন এর আগে কখনো আসেনি। স্বর্গের নন্দনবন যে উর্বশীর চরণ-লাঞ্ছিত হবার অপেক্ষায় প্রহর গনে, যার মঞ্জীর-ধ্বনিতে দেবকুলের হৃদয় উদ্বেলিত হয়, লক্ষ্মী যার রূপ-যৌবনকে ঈর্ষা করেন, দেবরাজের প্রমোদনিকেতন যার অনুপস্থিতিতে অন্ধকার—সেই উর্বশীর অঙ্গ-স্পর্শ সুখে আজ তিনি ধন্য।

কিন্তু রাজর্ষির এই মুহূর্তের আনন্দ-সুখ-চিন্তা পরমুহূর্তে বিপরীত চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যায়। কল্পিত ব্যথায় সিক্ত হয়ে ওঠে মন। ভাবেন, মর্তবাসী রাজা আমি—কিন্তু উর্বশী তো দেবলোকের। নন্দন কাননের নন্দিনী, স্বর্গ-সুন্দরী উর্বশী যে নারায়ণের কল্পনার সৃষ্টি—আমার হৃদয়কে সে শুধু ছলনাই করতে পারে, পারে না পূর্ণ করতে। সে তো আমার কাছে চিরদিনের মায়া-মরীচিকা হয়ে থাকবে।

উর্বশী যেন রাজর্ষির মনের কথা বুঝতে পেরেছে। ফিরে তাকালো রাজর্ষির চাতক-নয়নের দিকে। তার দৃষ্টির ইঙ্গিতে অনেক কথা মিশে

আছে। সে যেন দৃষ্টির ভাষা দিয়ে বলতে চাইছে, প্রথম দেখার মুহূর্তে তোমাকে ভালোবেসেছি রাজর্ষি—এই মুহূর্তে স্বর্গের আকর্ষণ আমি অনুভব করছি না, এখন তোমাতেই আমার হৃদয়-মন নিবেদিত।

—সখি উর্বশী! চিত্রলেখার ডাকে চমক ভাঙলো উর্বশীর। রাজর্ষির ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উতলাকণ্ঠে বলে উঠলো, আমার কি হয়েছে বল তো? আমার হৃদয়ে কখনো তো এমন তরঙ্গ ওঠেনি।

চিত্রলেখা যদিও নিরুত্তর, কিন্তু মুখে তার অর্থপূর্ণ হাসি।

উর্বশী বলে, সখি—আমার দেহটাকে তুই গাঢ় অলিঙ্গনে পীড়ন করতে পারিস?

চিত্রলেখা বলে, আমার অঙ্গস্পর্শে তুই সান্ত্বনা পাবি না সখি।

আকাশ পথে বিমানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সকলেরই দৃষ্টি এখন ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে।

উজ্জ্বল বর্ণের বিমান নেমে আসছে। অনুমিত হচ্ছে হয়তো এই হেমকূট পর্বত শীর্ষেই অবতরণ করবে।

উজ্জ্বল ধাতব বিমানে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। মনে হয়—যেন আলোকরথ নেমে আসছে।

বিমান আরো কাছে নেমে এসেছে। অপ্সরাগণ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, বিমানটি গন্ধর্বরাজের।

বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে গন্ধর্বরাজের বিমান অবতরণ করলো রাজর্ষির রথ-সন্নিকটে।

বিমানে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ স্বয়ং।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ রাজর্ষি পুরূরবার পরম সুহৃদ।

রাজর্ষি এতসময় আপন রথেই ছিলেন। গন্ধর্বরাজ বিমান থেকে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নেমে এলেন। এবং গন্ধর্বরাজের দিকে অগ্রসর হলেন।

গন্ধর্বরাজকে উত্তপ্ত আলিঙ্গন দিয়ে পুরূরবা বললেন, সুহৃদ্বরের সর্বার্থ মঙ্গল হোক।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ বললেন, দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে

আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি।

রাজর্ষি পুরূরবা বললেন, দেবরাজকে এই মর্তবাসী রাজার শুভেচ্ছা জানাবেন। তারপর বলুন আর কি সংবাদ? বড় আনন্দ হচ্ছে আপনাকে পেয়ে।

—সত্যিই এ আনন্দ আমারও। বিমান থেকেই আপনার জয়ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। বলে আনুপূর্বিক কথা বিবৃত করলেন গন্ধর্বরাজ।

উর্বশী যে দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা—এ সংবাদ দেবর্ষি নারদই ইন্দ্রের কর্ণগোচরে আনেন। সংবাদ শোনামাত্র ইন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়েন। নিজে না এসে তিনি উর্বশী উদ্ধারের জন্যে গন্ধর্বরাজকে প্রেরণ করেন। গন্ধর্বরাজ তাঁর নিজস্ব সেনা নিয়ে বিমানযোগে উর্বশীকে উদ্ধার করতে আসেন। কিন্তু আসার পথে গন্ধর্বরাজ শুনতে পান আকাশ পথে কারা যেন রাজর্ষির নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর বলছে রাজর্ষি পুরূরবা কেশীকে সংহার করে উর্বশী ও তার প্রিয় সহচরী চিত্রলেখাকে উদ্ধার করেছেন।

পুরূরবা যথোচিত বিনয় প্রকাশ করে বললেন, আমি নিমিত্ত মাত্র—সবই তো দেবরাজের আশীর্বাদ। নয়তো সামান্য মর্তবাসী আমি, আমার ক্ষমতা আর কতটুকু।

চিত্ররথ মৃদু হেসে বললেন, রাজর্ষির উপযুক্ত কথাই বটে। যাক, আমার একটি ইচ্ছার কথা আপনাকে নিবেদন করতে চাই বন্ধু—আশা করি আমার কথাটা আপনি ভেবে দেখবেন।

—বলুন।

—উর্বশীকে চিত্রলেখাসহ আপনি উদ্ধার করেছেন, আপনি যাই বলুন না, এ গৌরব আপনার। তাই আমার ইচ্ছা আপনিই উর্বশীকে দেবরাজের কাছে পৌঁছে দিন। তাছাড়া দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সুহৃদ—আপনার দর্শনে তিনিও প্রীত হবেন। অনেকদিন তো ইন্দ্রপুরীতে আপনার শুভাগমন ঘটেনি—উর্বশীকে নিয়ে ইন্দ্রপুরীতে গেলে স্বর্গবাসীগণ আপনাকে অভিনন্দিত করবে। আর বিলম্ব করবেন না রাজর্ষি, আপনি উর্বশীকে নিয়ে আপনার রথে অরোহন করুন।

পুরূরবা ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, কিছু মনে করবেন না প্রিয়

গন্ধর্বরাজ, আপনার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারছি না। তবে ইন্দ্রপুরীতে যাওয়ার ইচ্ছা সব সময়ে মনের মধ্যে পোষণ করি। কোনো এক সময় নিশ্চয়ই যাবো। আর যে কথা আগেও বলেছি, আবার বলছি—দৈত্য সংহার সম্ভব হয়েছে দেবরাজের আশীর্বাদে।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অভিভূত হলেন পুরূরবার কথায়। সানন্দে বলে উঠলেন, সত্যিই আপনি মহৎ রাজর্ষি। আমিও আপনার জয়ধ্বনি দিয়ে বলছি, রাজর্ষি পুরূরবার জয় হোক।

পুরূরবা এবারে অনুরোধের সুরে বললেন, প্রিয় গন্ধর্বরাজ আর কালক্ষেপ করবেন না। দেবরাজ নিশ্চয়ই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাছাড়া—

কথা শেষ না করে উর্বশীর দিকে তাকালেন পুরূরবা। উর্বশীর দৃষ্টি নত হলো।

গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজর্ষি কিন্তু কথা শেষ করেন নি।

পুরূরবা বললেন, আপনাদের প্রিয় অপ্সরারও বোধহয় দেহ ও মনের দিক থেকে বিশ্রামের প্রয়োজন। চিত্রলেখা, রম্ভা কিংবা আরো যারা, তারাও ক্লান্ত। তাছাড়া আমার মনে হয় স্বর্গপুরে যাবার জন্যে সবাই অধীর হয়ে উঠেছে।

চিত্রলেখা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু উর্বশীর দৃষ্টির ইঙ্গিতে চুপ করে গেল।

রম্ভা কথা বলতে ভালোবাসে। বললে, রাজর্ষি সত্যিই আমরা ক্লান্ত। একে কুবেরের নাটশালায় সারারাত নৃত্যগীত পরিবেশনের ক্লান্তি, তার ওপর সকাল থেকে মনের ওপর দিয়ে এই দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে।

পুরূরবা বললেন, আমার কথা তোমরা স্মরণে রেখো।

উর্বশী কি যেন বললে চিত্রলেখার কানে কানে। চিত্রলেখা নূপুরের ঝংকার তুলে রাজর্ষি সমীপে এলো। বললে, সখি উর্বশীর হয়ে আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে বলছি, আমাদের প্রিয় সখির ইচ্ছা স্বর্গপুরীতে সে আপনার মহানুভবতার কথা সগর্বে দেবসভায় প্রকাশ করবে।

রাজর্ষি কোনো কথা না বলে হাসলেন মাত্র।

চিত্রলেখা বললে, এবারে বিদায় দিন রাজর্ষি।

পুরূরবা তবুও নীরব।

চিত্রলেখা বললে, আবার হয়তো কোনো সময় দেখা হবে—আমাদের প্রিয় উর্বশী তো মনে মনে সেই ইচ্ছায় পোষণ করে।

পুরূরবা সে কথায় কথা না বলে বললেন, তোমরা আর দেরি কোরো না এসো তোমরা। গন্ধর্বরাজও বোধহয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এবারে অপ্সরাগণ একে একে গন্ধর্বরাজের রথে আরোহন করতে লাগলো। সব শেষে চিত্রলেখা আর উর্বশী।

রথের দিকে এগিয়ে যাবার সময় বাধা পেল উর্বশী। তার কণ্ঠের বৈজয়ন্তী হার জড়িয়ে গেল একটি বৃক্ষ শাখা সংলগ্ন লতায়। লতার বাঁধন থেকে হারটা মুক্ত করার সময় উর্বশী একবার বিহ্বল নয়নে তাকালো রাজর্ষি পুরূরবার দিকে।

দৃষ্টি নয়, যেন মদনদেবের সুতীক্ষ্ণ শর এসে বিঁধলো পুরূরবার হৃদয়ে।

মদনবাণে বিদ্ধ হবার যে কী জ্বালা এই মুহূর্তে মর্মেমর্মে অনুভব করলেন রাজর্ষি।

ওদিকে উর্বশী যেন কিছুতেই বৈজয়ন্তী হারছড়াটিকে লতার বাঁধন মুক্ত করতে পারছে না। যতবার ছাড়াতে যাচ্ছে ততবার জড়িয়ে যাচ্ছে। আর সেই অবসরে দৃষ্টি শরে এক-একবার বিদ্ধ করছে পুরূরবাকে।

পুরূরবার হৃদয় এখন ক্ষতবিক্ষত। মদনবাণের যন্ত্রণা তাঁর দেহমনকে বিবশ করে তুলছে।

পুরূরবা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—হয়তো এই মুহূর্তে উর্বশীর হৃদয়ও এমনি যন্ত্রণা অনুভব করছে।

পুরূরবা লক্ষ্য করলেন, উর্বশীর নয়নদ্বয় সিক্ত হচ্ছে। তার নয়নবারি মুক্তাবিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে পীন পয়োধরের ওপর। যেন অশ্রুবিন্দু দিয়ে আর একটি মালা গাঁথছে সুরসুন্দরী।

চিত্রলেখা অাঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে উর্বশীর নয়নপল্লব।

উর্বশীর নয়নদ্বয় কোমল অাঁচলের পীড়নও সহ্য করতে পারে না, রক্তিম হয়ে উঠলো তার চোখ দুটি।

চিত্রলেখার অাঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো উর্বশী। তার কোমল আঙুলগুলি

লতার বাঁধন থেকে বৈজয়ন্তী হারছড়াটিকে মুক্ত করতে অক্ষম।

কিন্তু চিত্রলেখা কত সহজে লতার বাঁধন থেকে হারছড়াটি মুক্ত করলো। আর উর্বশী তার কণ্ঠের মন্দার মালাটি ছিঁড়ে ফেলে দিল।

উর্বশীকে নিয়ে রথে আরোহন করলো চিত্রলেখা।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের বিমান উড়ে চললো আকাশমার্গে।

হেমকূট পর্বতশিখরে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন পুরূরবা। চিত্ররথের স্বর্গীয় বিমান দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করে গেছে, তবু পুরূরবা এখনো চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

—রাজর্ষি!

সারথির কণ্ঠস্বরে সচকিত হলেন পুরূরবা।

—সারথি!

—রথ প্রস্তুত রাজর্ষি।

—চলো।

পদক্ষেপ কালে পুরূরবা দেখলেন ছিন্ন মন্দার মালাটি পড়ে আছে পাথরের ওপর। মালাটি কুড়িয়ে নিলেন পুরূরবা। দু হাতের মুঠিতে ভরে ঘ্রাণ নিলেন। তারপর ছিন্ন মালা সযত্নে বুকের কাছে চেপে ধরে রথে আরোহন করলেন।

পুরূরবার সোমদত্ত নামক রথ আকাশ মার্গে ছুটে চললো প্রতিষ্ঠান নগরের উদ্দেশে।

পুরূরবার হৃদয় এখন নিঃসীম আকাশের মতো শূন্য। শুধু দেহটাই ফিরে যাচ্ছে স্বীয় রাজধানীতে, হৃদয়টা হরণ করে নিয়ে গেছে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

ছিন্ন মালাটি দু হাতের অঞ্জলিতে নিলেন পুরূরবা। কী হবে এই মন্দার মালা। দুদিন পরেই তো শুকিয়ে যাবে। তাছাড়া কী হবে এই স্মৃতি-স্মারকটুকু রেখে!

কিন্তু মহাশূন্যে মন্দার মালাটি নিক্ষেপ করতে গিয়েও নিক্ষেপ করতে পারলেন না। মালাটি যে উর্বশীর কণ্ঠের। ভাবলেন, হয়তো বিরহকাতর হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবে এই মন্দার মালিকা।

মালাটি বুকে চেপে রাখলেন পুরূরবা। অনুভব করলেন উর্বশীর অঙ্গ-

স্পর্শ-সুখ। গভীর আবেশে দুচোখ বন্ধ হয়ে এলো তাঁর।

রথের গতি মন্থর হয়ে এলো। পুরূরবা ফিরে তাকালেন। প্রতিষ্ঠাননগরী এখন দৃষ্টির সম্মুখে।

পুরূরবা দেখলেন রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশে রাজকীয় পতাকা পত পত করে উড়ছে।

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ক্ষেত্রের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠাননগরী। রাজর্ষি পুরূরবার রাজধানী।

লোকপ্রিয় রাজা পুরূরবা। প্রজাগণ যাঁর সতত বন্দনা করে। রাজ্যেরং সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজমান। রাজর্ষির একমাত্র চিন্তা, কিসে রাজ্যের এব প্রজাগণের আরো শ্রীবৃদ্ধি হবে। প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ কামনাই রাজর্ষির ধর্ম।

যেমন রাজর্ষি, তেমনই রানী কাশীরাজদুহিতা ঔশীনরী। উভয়ের হৃদয়-মন নিয়ত রাজ্যের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন।

সেদিন সূর্যবন্দনা শেষে পুরূরবা ফিরে এসেছেন রাজগৃহে—কিন্তু যেন অন্য মানুষ। রানী ঔশীনরী ভেবেছিলেন, হয়তো রাজ্যের কোনো চিন্তায় স্বামী এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এক-একদিন জানতেও চেয়েছেন, স্বামী আপনাকে এমন চিন্তান্বিত দেখছি কেন? পুরূরবা অসত্য বলেন না, তবু এক্ষেত্রে সত্যকে এড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি রানী।

কিন্তু ঔশীনরী রাজার একথা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর ধারণা, নিশ্চয়ই স্বামীর জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা তিনি ব্যক্ত করতে পারছেন না। একদিন গোপনে রথ-সারথিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেদিন সূর্য বন্দনা করে প্রত্যাবর্তনের পথে কোনো অঘটন ঘটেছিল কিনা। কিন্তু সারথি সে কথার উত্তরে বলেছিল, দেবী—আমি সারথি মাত্র, রথ চালনাই আমার একমাত্র কাজ, এর বাইরে আমার কিছু জানার কথা নয়।

শুধু ঔশীনরী নন, প্রাসাদের সকলেই রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে।

লক্ষ্য করেছে, রাজা আগের মতো রাজকার্যে মন দিতে পারছেন না। রাজসভাতে যদিও বসেন, কিন্তু আগের মতো আলোচনায় মুখর হন না। এখন তাঁর রাজসভায় আসা নিয়ম রক্ষা মাত্র। তাছাড়া রাজার শরীরও কেমন কৃশ হয়ে আসছে, দৃষ্টির সে ঔজ্জ্বল্যও আর নেই। এছাড়া রাজা কেমন যেন নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠছেন।

রানী ঔশীনরী শেষপর্যন্ত আবার একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি হয়েছে স্বামী!

পুরূরবা বললেন, কিছুই হয়নি।

রানী বললেন, আপনি আমাকে সত্য গোপন করছেন স্বামী—আপনার সে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের গাত্রত্বকের ঔজ্জ্বল্য আর নেই, আপনার দৃষ্টি নিষ্প্রভ, শরীরও কৃশ হয়ে আসছে, তাছাড়া আগের মতো স্বচ্ছ হাসিতে তো মুহূর্তের জন্যে আপনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না—এর পরেও কি আপনি বলবেন, কিছুই হয়নি।

পুরূরবা মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন। তারপর দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে রানীর চিবুকের নিচে রেখে বললেন, চলো রানী উদ্যান বিহার করে আসি।

—এখন দ্বিপ্রহর, রানী বললেন, এই কি উদ্যান বিহারের সময়!

পুরূরবা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, তবে চলো নিভৃত কোনো কক্ষে যাই।

রানী ঔশীনরী একবার তির্যক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পুরূরবা ডাকতে গেলেন রানীকে। কিন্তু পারলেন না। তিনি মুখে যাই বলুন, নিজে তো জানেন কেন এই ভাবান্তর।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুরূরবা স্ফটিক-দর্পণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এমন করে কখনো তিনি দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করেননি।

প্রতিবিম্বের চোখে চোখ রেখে পুরূরবা অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে কেমন যেন আত্ম-সম্মোহিত হয়ে পড়লেন তিনি।

প্রতিবিম্বে আপন মুখ, অথচ তাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলতে পারো আমার উর্বশী কি করছে এখন? সে কি ইন্দ্রলোকে সুখে আছে? না, আমার মতো পঞ্চশরের যন্ত্রণা অনুভব করছে?

কোনো সাড়া এলো না প্রতিবিম্বের কাছ থেকে।

পুরূরবা বললেন, সে কি জানে, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো আমি তিলেতিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি। যদি জানে, তবে কি সে একবার দেখা দিতে আসতে পারে না। সেকি তার অনন্ত রূপ যৌবন নিয়ে একটু সময়ের জন্যে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে না? আমি তাকে একবার দুচোখ ভরে দেখতাম।

পুরূরবার দেহমন কেমন শিথিল হয়ে আসছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। সরে এলেন দর্পণের সামনে থেকে। মন্থর পদক্ষেপে শয্যার দিকে এগিয়ে এলেন। কোমল শয্যায় এলিয়ে দিলেন হালকা দেহটা। দুচোখ বন্ধ করে মনের দর্পণে উর্বশীর ছবি দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উর্বশীর ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার আগেই মিলিয়ে যাচ্ছে। উর্বশী যেন মৃগতৃষ্ণিকার মায়া। যে শুধু ছলনাই জানে।

—রাজর্ষি।

বিদূষকের কণ্ঠস্বর!

পুরূরবা ফিরে তাকালেন। দ্বারদেশে বিদূষক দণ্ডায়মান।

—কি সুহৃদ? পুরূরবা উঠে বসলেন।

—রাজর্ষি কি আজও সভাগৃহে যাবেন না?

—আমি নিতান্তই ক্লান্ত সুহৃদ।

বিদূষক পুরূরবার প্রিয় পাত্র। কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিদূষক বললেন, রাজর্ষি যদি কিছু মনে না করেন. তাহলে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

—বেশ তো। পুরূরবা বললেন, কি তোমার প্রশ্ন?

—রাজর্ষির এই অবসাদ কি মানসিক?

বিদূষকের কথায় পুরূরবা মনে মনে বিচলিত হলেন। তবে কি বিদূষক কিছু অনুমান করেছে। রথ-সারথি কি উর্বশী প্রসঙ্গে কোনো কথা বিদূষককে বলেছে!

পুরূরবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিদূষকের মুখের দিকে তাকালেন। বিদূষক

স্বভাবত কিছুটা পরিহাস প্রিয়। কিন্তু এখন তো পরিহাসের উপযুক্ত সময় নয়।

তবু কোনো দ্বিধা না করেই বিদূষক বললেন, রাজর্ষির হৃদয়ে কি নতুন করে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে ?

পুরূরবা হঠাৎ কেমন যেন চমকিত হলেন।

বিদূষক এবারে একটু নীরব থেকে বললেন, হৃদয়ে যখন প্রণয় কিংবা অনুরাগের সঞ্চার হয়, তখন তার কাছে সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়। এমন কি রাজসিংহাসনও। রাজর্ষির জীবনে অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটেনি তো ?

পুরূরবা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, চলো সুহৃদ—দুজনে প্রমোদ উদ্যানের নির্জন কোণে গিয়ে বসি।

বিদূষক হাসলেন।

—হাসছো যে ! পুরূরবা কৌতূহলী হলো।

—প্রিয় রাজর্ষির কথায়। বিদূষক বললেন, আমার মতো একজন পুরুষকে নিয়ে প্রমোদ উদ্যানে যাওয়া—ব্যাপারটা হাসির নয় কি ! তবে রাজর্ষির কথা তো আমি উপেক্ষা করতে পারি না।

প্রিয় বিদূষককে নিয়ে রাজর্ষি প্রমোদ উদ্যানে এলেন।

সুসজ্জিত উদ্যান। কোথাও আম্রকুঞ্জ, কোথাও ফুলবন, কোথাও লতা-বিতান। উদ্যানের মাঝখানে সুন্দর দীর্ঘিকা—এখানে পদ্মবনে রানী ঔশীনরীর প্রিয় রাজহংস রাজহংসীরা ক্রীড়ারত।

বিদুষককে নিয়ে উদ্যান পরিভ্রমণ করে রাজর্ষি দীর্ঘিকার মর্মর সোপানে উপবেশন করলেন। কিন্তু রাজর্ষির মুখে কোনো কথা নেই। তাঁর দৃষ্টি পদ্মবনে ক্রীড়ারত হংসদলের দিকে।

একসময় চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পুরূরবা।

বিদূষক বললেন, আমি অনুমান করি রাজর্ষির হৃদয়ে কোনো সুখস্মৃতি অহরহ দংশন করছে। সুখস্মৃতি যত না আনন্দ দেয় তার চেয়ে বেদনা দেয় বেশি। রাজর্ষি কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনো কথা আমার কাছে গোপন করেন নি।

—বিদূষক !

—আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন কোন্ চিন্তা আপনাকে এমন বিমর্ষ করেছে, কেন আপনি নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন!

বিদূষকের হাত চেপে ধরলেন পুরূরবা। বললেন, বিদূষক সত্যিই আমি নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। রাজকার্যে মন নেই, সিংহাসন আর আমায় আকৃষ্ট করছে না—রানী ঔশীনরী তো মানবী নয়—দেবী, সে আমার জীবন-সর্বস্ব ছিল, অথচ সেই দেবীও যেন হৃদয়কে আর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। সুজর্নি, শ্রেণী, সুম্ন, গ্রন্থিনীর মতো যৌবনবতী—সুন্দরীরা যারা একান্তভাবে আমার, তারাও আমাকে আর আকৃষ্ট করে না। বিদূষক আমার হৃদয়ে এখন একটি মাত্র নাম—উর্বশী।

বিদূষক কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না। ক্রীড়ারত হংসদলের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, রাজর্ষি যে সেদিন সূর্যবন্দনা শেষে সৌরলোক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কেশী দৈত্যকে সংহার করে উর্বশী সহ চিত্রলেখাকে উদ্ধার করেছিলেন একথা অজানা নেই।

পুরূরবা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন বিদূষকের দিকে।

বিদূষক মৃদু হেসে বললেন, একথা প্রাসাদের আর কেউ জানে না সুহৃদ। যে ভাবে হোক আমি জেনেছি মহারাজ। যাইহোক দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে এই দৈত্যসংহার এবং উর্বশী উদ্ধারের কথা খুব বেশিদিন অপ্রকাশিত থাকবে না। রাজর্ষি, একটি কথা জানতে চাই, উর্বশী কি সুহৃদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল?

—বিদূষক, তার মোহিনী দৃষ্টির কথা ভুলতে পারছি না, ভুলতে পারছি না সেই মুহূর্তের কথা, যখন তার সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো দুটি নয়ন দিয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছিল।

—তারপর?

—আর কি বলবো বন্ধু, সুরলোকবন্দিতা উর্বশী আমার কাছে মূর্তিমতী সৌন্দর্য। তার অলক্তরাগ রঞ্জিত চরণের নখাগ্র থেকে কেশগুচ্ছ—কোথাও কোনো খুঁত নেই। এমন রূপ কল্প-মানসেও আঁকা যায় না।

—রাজর্ষির দৃষ্টির প্রশংসা করি। বিদূষক উঠে দাঁড়ালেন। পুরূরবা বললেন, কোথায় যাচ্ছো!

—সুহৃদ, আপনি এখন নির্জনে সুখস্মৃতি রোমন্থন করুন। বিদূষক বললেন, হয়তো পঞ্চশরে বিদ্ধ হৃদয়-যন্ত্রণার তাতে উপশম হবে।

বিদূষক আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন উদ্যানের বাইরে। পুরূরবা এখন একা বসে দীর্ঘিকার সোপানে। তাঁর দৃষ্টি পড়লো পদ্মবনের দিকে। দেখলেন, রানীর প্রিয় রাজহংসীটি উন্নত গ্রীবার রাজহংসটির সঙ্গে রতি-ক্রীড়ায় মত্ত।

দীর্ঘিকার সোপানে বসে পুরূরবা সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। মনের মধ্যে অপূর্ব এক রোমাঞ্চ শিহরণ। এই মুহূর্তে রাজর্ষির হৃদয়-মন উর্বশীময়। যদিও স্মৃতি, তবুও পুরূরবা অনুভব করছেন কোমলতনু উর্বশীর অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ।

কখন নিঃশব্দ চরণে রানী ঔশীনরী এসে দাঁড়িয়েছেন, জানেন না পুরূরবা। স্মৃতি মন্থনে আত্মমগ্ন রাজর্ষি। আনন্দমিশ্রিত যন্ত্রণার অনুভূতিতে পুরূরবার দুইচোখ অশ্রুসিক্ত।

—রাজর্ষি কার ধ্যান করছেন ?

সচকিত পুরূরবা ফিরে তাকালেন। দেবী প্রতিমার বেশে রানী এসে দাঁড়িয়েছেন।

পুরূরবার দৃষ্টি এখন রানীর মুখের রেখায়।

—অমন করে কী দেখছেন স্বামী ?

—দেখছি তোমাকে।

—আমাকে !

—হ্যাঁ।

ঔশীনরী বসলেন রাজর্ষির পদপ্রান্তে। বললেন, স্বামী—আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনি মানসিক ভারসাম্য হারাতে চলেছেন।

পুরূরবা বললেন, দেবী—আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাও।

ঔশীনরীর মুখে হাসি ফুটলো। বড় করুণ সে হাসি। বললেন, স্বামী, যদি আপনার মনে হয়, আমাতে আপনার মন নেই, তাহলে সে কথা আপনি অসংকোচে বলুন।

পুরূরবা কি আর বলবেন, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রানীর মুখের

দিকে। তবে কি বিদূষকের মতো রানীও সব জানেন!

ঔশীনরী বলতে লাগলেন, স্বামী কোথায় গেল আপনার সেই ভুবনমোহন রূপ, কোথায় গেল সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের সেই দৃপ্ত পৌরুষ! আপনার দেহের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ এখন কালিমা লিপ্ত, আয়ত চক্ষুদ্বয় বিবরে প্রবিষ্ট, তারপর ললাটদেশের গভীর কুঞ্চনরেখাগুলো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। স্বামী, আপনি কেন বলতে পারছেন না আপনার গোপন কথা!

পুরূরবা এবারে আর কোনো কথা নয়, রানীকে আপন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে দক্ষ অভিনেতার মতো বললেন, কোন্ গোপন ব্যাপার থাকতে পারে দেবী! আমার যত রাগ-অনুরাগ সবই তোমাকে ঘিরে।

ঔশীনরী ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর রাজার বক্ষদেশে করস্থাপন করে বললেন, আমি জানি রাজর্ষি কখনো মিথ্যা বলেন না।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার প্রেম আমাকে নিয়ত উজ্জীবিত করে, তোমার সান্নিধ্য আমাকে তৃপ্তি দান করে, এ কথা তো মিথ্যে নয় রানী।

ঔশীনরীর মুখপদ্ম আপন করপুটে গ্রহণ করে তাঁর রক্তিম অধর নিবিড় চুম্বনে সিক্ত করলেন পুরূরবা।

ঠিক এই মুহূর্তে মঞ্জীর ধ্বনি শোনা গেল। কারা যেন নূপুরশিঞ্জিত পদক্ষেপে এই দিকে আসছে।

রাজা রানী দুজনে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁদের আদরের ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে। কিছুদিন আগে রানী ওদের পায়ে নূপুর বেঁধে দিয়েছেন।

রাজর্ষি আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশের ঈশান কোণে ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ।

রাজর্ষির মনটা দুলে উঠলো। এখন বসন্তকাল, আকাশে মেঘের সঞ্চার কেন! কোনো অশুভ সংকেত বহন করে আনেনি তো ওই মেঘ।

মুহূর্তে রাজার হৃদয়-মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ঐ ঈশান কোণেই দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিল উর্বশী।

রানী ঔশীনরীও ঈশান দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। বললেন, সন্ধ্যা আসন্ন—আমার মন্দিরে যাবার সময়

হয়ে এলো। রাজর্ষি কি এই দীর্ঘিকার সোপানেই সন্ধ্যা অতিবাহিত করবেন?

—বেশ ভালো লাগছে রানী।

—যদি বর্ষণ শুরু হয়?

—বসন্তকালের অকাল বর্ষণে সিক্ত হবো।

রানী ঔশীনরী মৃদু ঝংকার তুলে হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে, আপনি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত যাপন করুন, আমি চললাম।

দীর্ঘিকার মর্মর সোপানে এখন একা পুরূরবা।

কিছুক্ষণ বসে থেকে রাজহংস-রাজহংসীর রতিক্রীড়া লক্ষ্য করলেন পুরূরবা। তারপর হংসযুগল যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে সাঁতার কেটে তীরভূমির দিকে অগ্রসর হলো, তখন পুরূরবার চিত্তের অবসাদ চরমে পৌঁছলো। এত সময় তিনি বসেছিলেন মর্মর সোপানে, এবারে শিথিল ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লেন। রাজহংসটির মতো তিনিও এখন ক্লান্ত, অবসন্ন।

বিদূষক আবার প্রমোদ উদ্যানে রাজর্ষি সমীপে এসেছেন। পুরূরবা তখনো মর্মর সোপানে শয়ন করে আছেন।

বিদূষক রাজর্ষিকে এই অবস্থায় দেখে মনে মনে বিচলিত হলেন। উর্বশী বিরহে শেষটা না রাজর্ষির চিত্ত বিভ্রম ঘটে। মণিমুক্তা খচিত পালঙ্কে যিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন, তিনি প্রস্তর সোপানে শয়ন করে আছেন—নিয়তির কী নির্মম পরিহাস।

—রাজর্ষি!

—প্রিয় বিদূষক!

—হ্যাঁ রাজর্ষি। বিদূষক যদিও পরিহাস প্রিয় মানুষ, তবু তাঁরও সংবেদনশীল মন আছে। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আপনি মর্মর শয্যা ত্যাগ করুন। আসুন উদ্যান মধ্যে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করি। তাতে হয়তো হৃদয়-যন্ত্রণার উপশম হবে।

রাজর্ষি উঠে বসলেন। বেদনামথিত কণ্ঠে বললেন, এই পুষ্পিত উপবন, দীর্ঘিকার পদ্মদল, সুন্দর লতাবিতান—কোনো কিছুই আমার মনে রেখাপাত করছে না। হৃদয়ের শূন্যতা উর্বশী ছাড়া আর কেউ পূর্ণ করতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধু—আমি বুঝতে পারছি না মদনদেব কেন এত যন্ত্রণা দিচ্ছেন! উর্বশীর সেই দৃষ্টিশর, তার অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ আমি যে কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছি না।

বিদূষক এই মুহূর্তে রাজর্ষিকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। রাজর্ষিও আর কথা না বলে আকাশের দিকে তাকালেন।

একটু আগে ঈশান কোণে যে ঘন কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিয়েছিল, সে মেঘ এখন নেই। মেঘমুক্ত আকাশে এখন শুক্ল পক্ষের চাঁদ।

উর্বশীর চিত্তেও অস্থিরতা। পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন পুরূরবা, অনুরূপ যন্ত্রণা সুরসুন্দরী উর্বশীকেও মথিত করছে।

রাজর্ষি পুরূরবাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্তে তার মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। আর সেই মুহূর্তেই প্রেম নিবেদন করেছিল কন্দর্পকান্তি রাজর্ষিকে। একবারও তার মনে হয়নি সে স্বর্গের অপ্সরা—সে ভাবেনি স্বর্গলোকের দেবকুল অহরহ তার রূপ-যৌবনের বন্দনা করেন—ভাবেনি, সে নারায়ণের মানস-প্রতিমা।

পুরূরবাকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদন করার শুভক্ষণেই সে অনুভব করেছিল, যাঁর প্রতি তার প্রেম নিবেদন, সেই মর্তবাসী রাজা পুরূরবাও তাকে আত্মনিবেদন করেছেন। পরস্পরের হৃদয় বিনিময় ঘটেছিল নিঃশব্দে। কারো মুখ দিয়ে প্রণয় নিবেদনসূচক একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

প্রেম যখন আসে, নিঃশব্দেই আসে।

পুরূরবাকে নীরব প্রেম নিবেদনের পর সে স্বর্গলোকে ফিরে এসেছে, কিন্তু হৃদয় দান করে এসেছে মর্তবাসী রাজাকে।

স্বর্গপুরে আর কেউ না জানুক, অপ্সরাবৃন্দের কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই। সখি চিত্রলেখা তো সবই জানে।

উর্বশীর হৃদয়-মন এখন পুরূরবার চিন্তায় বিভোর। তার হৃদয় সিংহাসনে এখন সৌম্যকান্তি রাজর্ষি ছাড়া অন্যের স্থান নেই।

কিন্তু পুরূরবার সঙ্গে মিলনের পথে যে দুস্তর বাধা। উর্বশী সুরলোক বাসিনী, আর রাজর্ষি মর্তবাসী।

স্বর্গ আর মর্তের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান।

উর্বশী ভাবে, তবে কি সে কোনোদিন পুরূরবার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না! হয়তো ভ্রমণের অজুহাতে পুরূরবা সন্দর্শনে যেতে পারে, কিন্তু তাকে তো স্বর্গপুরে ফিরে আসতেই হবে। আর গোপন অভিসারের কথা যদি দেবরাজ জানতে পারেন, তা হলে তো সর্বনাশ। তাই তো উর্বশীর মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন পুরূরবাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্তে কন্দর্পদেব তার হৃদয় মনকে অমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিলেন কেন! স্বর্গপুরে সে তো পরম সুখেই দিন যাপন করছিল। দুঃখ কি বেদনা তো তার ছিল না।

উর্বশী বুঝতে পারে না, কি সে করবে। আর এ মনোবেদনার কথা কাকেই বা জানাবে। শুধু একজনকেই জানাতে পারে, সে হলো সখি চিত্রলেখা। তাও সে লজ্জায় বলতে পারে না

উর্বশীর চোখে মুখে চিন্তার ছায়াটা স্পষ্ট। তাছাড়া কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সে। যে উর্বশীর নৃত্যে কখনো তালভঙ্গ হয় না, তাও হচ্ছে। ইন্দ্রসভায় শৃঙ্গার নৃত্যেও তার দ্বিধা। অথচ প্রতিদিন তাকে ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করতে হয়, অভিনয়ে তৃপ্তি দিতে হয় দেবদেবীগণকে। কিন্তু সবই সে করছে যন্ত্রের নিয়মে। কোনো কিছুতেই সে মনঃসংযোগ করতে পারছে না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অভিনয়পটিয়সী উর্বশী তার মনের কথা বুঝতে দেয়নি কাউকে।

একদিন নন্দনবনের নিভৃত কোণে চিত্রলেখার কাছে উর্বশী তার মনোবেদনার কথা প্রকাশ করে বললে, প্রিয় সখি, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। রাজর্ষিকে দেখার পর থেকে এই এতদিন—কি ভাবে যে কেটেছে, তোকে বোঝাতে পারবো না। আমার কি হবে বলতো!

চিত্রলেখা নীরব।

—কি রে কিছু বল?

চিত্রলেখা এখনো চুপচাপ। শুধু একবার মুখ তুলে উর্বশীর দিকে তাকালো।

—তুই কি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিস?

চিত্রলেখা এবারে বললে, কি বলবো বল সখি! আমার কথায় তো তোর মনের জ্বালা জুড়োবে না।

—তা জানি। উর্বশী বললে, তবু তো দুটো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে পারিস।

চিত্রলেখা এবারে না হেসে পারলো না। বললে, সখি—সত্যিই তোর মতিভ্রম হয়েছে।

উর্বশী দু হাতে চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরে তার অঙ্গ পীড়ন করতে থাকে।

চিত্রলেখা বলে, আমি তো সেই দৈত্য সংহারকারী মর্তবাসী রাজা নই, আমার অঙ্গ স্পর্শে কী লাভ?

উর্বশী বললে, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না সখি। পারিজাত পুষ্পের শয্যাতেও এখন কন্টকের জ্বালা—মন্দারমালিকার ভার কণ্ঠে বহন করতে পারি না, এই নন্দনবন যেখানে আমরা বসে আছি, এই বনের কোনো সৌন্দর্যই আর আমাকে আকৃষ্ট করে না। এমন কি ইন্দ্রের আলিঙ্গনও আর আমাকে সুখ দেয় না।

চিত্রলেখা এখন কী যেন চিন্তা করছে। সখি উর্বশীর হৃদয়-বেদনা তাকেও ব্যথিত করেছে।

উর্বশী বললে, সখি—একটা কথা বলবো। যাবি আমার সঙ্গে।

চিত্রলেখা বললে, কোথায়?

উর্বশী বললে, সে-ও বলে দিতে হবে।

চিত্রলেখার মুখে এবার হাসি ঝংকৃত হলো। বললে, বুঝেছি। কিন্তু—

উর্বশী উতলা হয়ে উঠেছে। বললে, কোনো কিন্তু নয় সখি। চল, আমাকে অভিসারিকার বেশে সাজিয়ে দিবি।

উর্বশীকে মনের মতো করে সাজালো চিত্রলেখা। পরনে আকাশ-নীল রঙের বসন, বক্ষদেশে মণিমুক্তা খচিত স্তনাবরণ বস্ত্র, কণ্ঠে বৈজয়ন্তী হারকে লজ্জা দিচ্ছে মন্দার পুষ্পের সুগ্রন্থিত মালিকা, চরণদ্বয়ে সযত্ন-অঙ্কিত অলক্তরাগ, পাদমূলে রজত-মঞ্জীর, কটিদেশে স্বর্ণ মেখলা, আর স্বর্ণসূত্র দিয়ে

রচিত কবরীতে অর্ধপ্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম, আয়ত চক্ষুদ্বয় দীর্ঘায়ত হয়েছে কজ্জলরেখায়।

চিত্রলেখা অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকে অনুপম রূপসজ্জায় সজ্জিতা উর্বশীর দিকে।

উর্বশী লাজনম্র ভঙ্গিতে বলে, কি দেখছিস সখি?

চিত্রলেখা বলে, তোকে। দেখছি আর ভাবছি।

উর্বশী বলে, কী ভাবছিস?

চিত্রলেখা বলে, আমি যদি পুরূরবা হতাম।

উর্বশী আর অপেক্ষা করতে পারছে না। তার শরীর-মন এখন দয়িত দর্শনের জন্যে উন্মুখ। চিত্রলেখা দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলে, সখি এবারে চল—আর তিলমাত্র দেরি করতে পারছি না।

দুইসখি আকাশ-রথে আরোহন করলো।

স্বর্গলোক থেকে স্বয়ংক্রিয় রথ আকাশ পথে উড়ে চললো মর্তধামে রাজা পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠাননগরীর উদ্দেশে।

দুই-সখি উর্বশী এবং চিত্রলেখা এখন অপরাজিতা বিদ্যাবলে নিজেদেরকে অদৃশ্য রেখেছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, মানব—কারো দৃষ্টিতে ওদের ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। এ বিদ্যা ওরা আয়ত্ত করেছিল দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে।

কিন্তু দুই সখির চোখে সব কিছুই স্পষ্ট।

উর্বশীর মনে এখন চিন্তা, সে তার দয়িতের দেখা পাবে তো।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-সন্নিকটে রাজর্ষি পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠাননগরী। আর রাজপ্রাসাদের অবস্থিতি সঙ্গমক্ষেত্রের নিকটেই।

রাজর্ষি পুরূরবা এখন শ্বেত মর্মর-নির্মিত মণিহর্ম্য-সংলগ্ন প্রমোদ উদ্যানে প্রিয় বিদূষকের সঙ্গে কথা বলছেন।

রাজর্ষি এখন উর্বশী বিরহে এমনই কাতর যে, উর্বশীর কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই তাঁর মুখে। তবুও বিদূষক বললেন, প্রিয় রাজর্ষি আপনি নিজেকে উর্বশী চিন্তামুক্ত করতে সচেষ্ট হোন, চেষ্টা করুন নিদ্রাসুখের জন্যে।

আপনি নিজেকে এভাবে নির্মম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন না।

রাজর্ষি ম্লান হেসে বললেন, আমি অবোধ নই বিদূষক। আমি জানি, রাজা আমি, আমার ধর্ম রাজধর্ম। কিন্তু প্রণয় এমনই অন্ধ যে, সব কিছু বিস্মৃত হতে হয়।

ইতিমধ্যে অদৃশ্য আকাশ-রথ রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এসে গেছে। রাজপ্রাসাদ দেখে চিত্রলেখা এমনই বিস্মিত যে, সে উর্বশীকে বললে, সখি চেয়ে দেখ, কী সুন্দর মর্মর প্রাসাদ।

চিত্রলেখা বললে, আমার মনে হয়, বিরহকাতর রাজার উপযুক্ত স্থান মণিহর্ম্য সংলগ্ন উদ্যান।

আকাশ রথ উদ্যানের নিভৃত কোণে লতাবিতানের আড়ালে ভূমি স্পর্শ করলো। চিত্রলেখা ও উর্বশী দুজনেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, এই প্রমোদ উদ্যান যেন স্বর্গের নন্দনকানন সদৃশ।

অপ্সরাদ্বয় কানন অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। দেখলো, উদ্যানের শ্যামল দূর্বাদলের ওপর রাজর্ষি বসে আছেন। যদিও ম্লান তবুও সুন্দর।

উর্বশী আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সখি চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরে বলে, কী অপরূপ রূপ রাজর্ষির। চোখ ফেরাতে পারছি না।

চিত্রলেখা বললে, রাজার মুখ দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, কৃষ্ণপক্ষের পর ধরিত্রী যেমন চন্দ্রের প্রতীক্ষায় আছেন। চল, কাছে যাই। অন্তরাল থেকে শুনি রাজর্ষি কি বলছেন। আর কেনই বা এই উদ্যানে এসেছেন।

দুই সখি এখন রাজর্ষি যেখানে বসে আছেন, সেই দিকেই এগিয়ে এলো।

রাজর্ষি বলছেন, প্রতি সন্ধ্যায় আমি উদ্যান মধ্যে আসি, তার অপেক্ষায় প্রহর গণনা করি। কিন্তু কই তার দেখা তো পাচ্ছি না।

উর্বশী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো চিত্রলেখার দিকে। অস্ফুটকণ্ঠে চিত্রলেখার কানে কানে বললে, রাজর্ষি কার প্রতীক্ষায় আছেন বল তো?

চিত্রলেখা বললে, তুই তো ধ্যানযোগে জানতে পারিস, দেখ না যদি বিরহী নায়কের আকাঙ্ক্ষিতাকে চিনতে পারিস।

উর্বশী বললে, না সখি—আমার ভয় করছে। হয়তো রাজর্ষির এই ক্ষণের আকাঙ্ক্ষিতা অন্য কেউ।

চিত্রলেখার ইঙ্গিতে উর্বশী চুপ করে গেল।

ওদিকে বিদূষক বলছেন, রাজর্ষি, আপনি তো দক্ষশিল্পী—উর্বশীর একটি চিত্র অঙ্কন করতে তো পারেন। চিত্রে উর্বশীকে দেখে আপনার তৃষিত মন তৃপ্তি পাবে আর বিরহতাপদগ্ধ হৃদয়ও শান্তি পাবে।

বিদূষকের কথায় উর্বশী যেন স্বস্তি পেল।

রাজর্ষি তখন করুণ হাসি হেসে বলছেন, বন্ধু—ছবি আঁকবো কি করে। যখনই তাকে মানস কল্পনায় আঁকতে যাবো, তখনই আমার চোখ জলে ভরে যাবে। চোখের জলে দৃষ্টি যদি ঝাপসা হয়ে যায়, ছবি আঁকবো কেমন করে। জানো বন্ধু, যখন প্রথম সুরসুন্দরীকে দেখেছিলাম, সেই প্রথম দেখার মুহূর্তেই আমার হৃদয়কে উপহার দিয়েছিলাম সেই সুরসুন্দরীকে, আর তার হৃদয়-স্পর্শ আমি পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার প্রতি মদনদেবের কি অপার করুণা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শুধু আমাকে জর্জরিত করবার জন্য তিনি এই প্রেমের খেলা খেলছেন। নয়তো আমার উর্বশী কি একটিবার আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতো না ! সে কি শুধু প্রেমের ছলনাই জানে।

উর্বশী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে তিরস্করণী আচ্ছাদন অপসৃত করে রাজর্ষির কাছে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কেমন যেন দ্বিধা জড়িয়ে ধরে।

চিত্রলেখা বলে, অমন উতলা হচ্ছিস কেন ?

উর্বশী বলে, ভাবছি মায়াবিদ্যা বলে ভূর্জপত্র তৈরি করে তাতে আমার প্রেম নিবেদন করে রাজর্ষির পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করি।

চিত্রলেখা বলে, বেশ তো সখির যেমন ইচ্ছা।

মায়াবিদ্যা প্রয়োগ করে ভূর্জপত্র প্রস্তুত করলো উর্বশী। তাতে সে তার মনের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে রাজর্ষির দিকে নিক্ষেপ করলো।

বাতাসে উড়তে উড়তে ভূর্জপত্রটি রাজর্ষির সামনে এসে পড়লো।

ভূর্জপত্রটি দেখে রাজা প্রথমটা মনে ভেবেছিলেন কি না কি, কিন্তু পরক্ষণে কৌতূহল ভরে পত্রটি হাতে নিলেন।

এক নজরে পত্রটি পাঠ করেই অভিভূত হলেন। উর্বশীর পত্র। কিন্তু কোথায় উর্বশী! তবে কি এ এক নতুন কোনো প্রহেলিকা!

রাজর্ষি পত্রে মনঃসংযোগ করে আছেন দেখে বিদূষক নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। কেননা এই মুহূর্তে হয়তো রাজর্ষি একা থাকতেই চাইছেন।

চিঠিখানি বারবার পড়তে লাগলেন পুরূরবা। উর্বশী তাঁকে স্বামী সম্বোধন করে লিখেছে, প্রিয় স্বামী, তুমি হয়তো মনে করেছো, আমি স্বর্গলোকবাসিনী—তোমাকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমার মনোবেদনার কথা আমি অনুভব করিনি। এ ভাবনা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা অনুরূপ ভাবনা আমাকেও ভাবিত করেছে। যাই হোক, আমি আজ তোমাকে জানাচ্ছি, স্বর্গ আর আমাকে সুখ দেয় না, নন্দনবন—যেখানে চিরবসন্ত জাগ্রত, সেই নন্দনবনও আমাকে তৃপ্তিদান করে না, পারিজাতকুসুম দিয়ে প্রতি নিশীথে আমার পুষ্পশয্যা রচিত হয়—সেই শয্যাও আমাকে সুখ নিদ্রা দেয় না। তোমার মতো আমিও বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছি।

কিন্তু কোথায় উর্বশী!

কে এই পত্রখানি নিয়ে এসেছে!

চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন রাজর্ষি। কেউ নেই। এমন কি বিদূষকও কখন চলে গেছে।

রাজর্ষির দেহে-মনে নতুন করে বিরহ যন্ত্রণা দেখা দিল। এ যন্ত্রণা আরো তীব্র। কখন যে শিথিল অঙ্গুলির বন্ধন থেকে ভূর্জপত্রটি পড়ে গেছে, সেদিকেও খেয়াল নেই রাজর্ষির।

একসময় লক্ষ্য করলেন পুরূরবা, অদূরে একটি কুটজ বৃক্ষের পল্লব আন্দোলিত হচ্ছে। রাজর্ষি সেই দিকেই অগ্রসর হলেন।

এদিকে উর্বশী ক্রমশ আরো অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ চিত্রলেখার সেই এক কথা—ধৈর্য ধর সখি, উতলা হোস নে।

উর্বশী বললে, সখি চিত্রলেখা—তুই একবার যা।

চিত্রলেখা একটু চিন্তা করলো। তারপর বললে, ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

তিরস্করিণী আচ্ছাদন পরিত্যাগ করে চিত্রলেখা মঞ্জীর ধ্বনি তুলে নৃত্যের

ছন্দে এগিয়ে চলে।

রাজর্ষির দুচোখ তখনো উর্বশীকে সন্ধান করছে। যদিও সামনে চিত্রলেখা।

—রাজর্ষি আমার অভিনন্দন করুন। চিত্রলেখা নত মস্তকে রাজর্ষিকে প্রণাম নিবেদন করে বললে, আর আমার প্রিয় সখি উর্বশীর হয়ে কয়েকটি কথা আপনাকে নিবেদন করছি।

চিত্রলেখাকে 'প্রিয় সখি' সম্বোধন করে রাজর্ষি বললেন, বলো তোমার সখি কি বলতে চেয়েছে!

—সখি উর্বশী জানিয়েছে, আপনি বীর, কেশী দৈত্যের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু এখন সে মদন বাণে জর্জরিতা—এখন একমাত্র আপনিই তাকে তৃপ্তি দানে সুখী করতে পারেন।

রাজর্ষি পুরূরবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। করুণ সে হাসি। তাঁর চোখের কোণেও জল বিন্দু দেখা দিল। ধীর কণ্ঠে বললেন, অদৃষ্টের এই পরিহাস সখি। তোমার সখি শুধু নিজের কথাই ভেবেছে, সে কি আমার কথা একবারও ভেবে দেখেছে? যে মদনবাণের যন্ত্রণা তোমাদের প্রিয় সখি ভোগ করছে, আমি পুরূরবা ততোধিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমি কি মনে করি জানো চিত্রলেখা, চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না, তেমনি আমার জীবনেও তোমাদের সখি। আমি আর কৃষ্ণপক্ষে বন্দী থাকতে পারছি না সুন্দরী। চিত্রলেখা, তুমিই পারো সেই অনন্ত জ্যোৎস্নারূপিনী তোমাদের প্রিয়সখি উর্বশীর সঙ্গে আমার মিলন ঘটাতে।

চিত্রলেখা হাসি মিশিয়ে বললে, মহারাজের ইচ্ছা অচিরেই পূর্ণ হবে।

ইঙ্গিত করলো চিত্রলেখা। তিরস্করিণী অবারণ অপসারণ করে উর্বশী এবার স্বমূর্তি ধারণ করলো। কিন্তু চলতে গিয়ে তার পা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু চলছে।

পুরূরবার কানে আসছে মৃদু সুমধুর মঞ্জীর ধ্বনি। পুরূরবা অনুমান করতে পারছেন না কোন্ দিক থেকে মঞ্জীর ধ্বনি আসছে।

চিত্রলেখা আঁচলে মুখ ঢেকে হাসছে।

পুরূরবা এবারে দেখতে পেলেন উর্বশীকে। কুন্দনিন্দিত শুভ্রকান্তি উর্বশী

বিচিত্র ছন্দে এগিয়ে আসছে। তার ঢল ঢল অঙ্গ আন্দোলিত হচ্ছে নৃত্যের তালে তালে।

পুরূরবা অবাক চোখে দেখছেন—এ স্বপ্ন-মায়া, না সত্যি! বাতাসে মিশে আছে উর্বশীর অঙ্গ গন্ধ—পুরূরবা ঘ্রাণ নিলেন। এ সুরভি নিশ্চয়ই কোনো স্বর্গীয় কুসুম নির্যাসের।

গভীর আবেশে দু চোখ বন্ধ হয়ে আসে পুরূরবার।

—মহারাজের জয় কামনা করি।

পুরূরবার সর্বশরীর অনির্বচনীয় আনন্দে রোমাঞ্চিত হলো। এ রোমাঞ্চ তাঁর মনেও। উর্বশীর হাত দুটি ধরে বললেন, সুন্দরী—আজ আমার পরম সৌভাগ্য, এই বোধহয় প্রথম এমন একজনের মুখে আমার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হলো, যে দেবরাজ ইন্দ্র ছাড়া অন্য কারো নামে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেনি।

উর্বশীর নয়নদ্বয় এখন পুরূরবার নয়ন দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করছে। আর পুরূরবা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সৌন্দর্য-প্রতিমা উর্বশীর মুখের দিকে।

কারো মুখে এখন কোনো কথা নেই। অথচ মনের মধ্যে কত কথার গুঞ্জন। আর চিত্রলেখা একান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে এখন দর্শকের ভূমিকায়।

—উর্বশী! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে শুধু উর্বশীর নামটুকু উচ্চারণ করলেন পুরূরবা।

—রাজর্ষি! উর্বশী আরো কিছু বলতে গেল, কিন্তু পারলো না।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে অবতরণ করলো।

দেবদূতকে দেখে চমকিত হলো চিত্রলেখা। যদিও চিত্রলেখা জানে দেবদূতের আগমনের হেতু।

কিন্তু উর্বশীর চেতনা এমনই আচ্ছন্ন যে, দেবদূত এসেছে তা বুঝতেও পারেনি।

দেবদূত এই মুহূর্তে উর্বশীর সুখ-চিন্তার ছেদ টানতে চাইলো না। চিত্রলেখাকে ডেকে বললে, চিত্রলেখা—তোমার সখিকে বলো এখনি স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

—তোমার কথা তুমিই বলো দেবদূত। চিত্রলেখা বললে, দীর্ঘ বিরহের পর দু জনে মিলিত হয়েছে, আমি কি পারি এই সুন্দর একটি মুহূর্তে ওদের মিলিত স্বপ্নে যতিচিহ্ন টানতে ?

—কিন্তু সুন্দরী চিত্রলেখা, দেবদূত বললে, আমি কেমন করে এখন উর্বশীর কাছে যাবো। তুমি সখিকে স্মরণ করিয়ে দাও, ইন্দ্রসভায় আজ লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটক অভিনীত হবে। নাটকের রচয়িত্রী স্বয়ং দেবী সরস্বতী। আর আচার্য ভরতের উপস্থাপনায় শ্রেষ্ঠ নাটক এটি। উর্বশীই এ নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করবে। উর্বশী হয়তো বিস্মৃত হয়েছে, তুমি তাকে স্মরণ করিয়ে দাও চিত্রলেখা।

চিত্রলেখা ধীরে পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। উর্বশীকে ডাকলো। বললে, সখি—সুখের মুহূর্ত ক্ষণস্থায়ী। দেবদূত এসেছে।

উর্বশী বিস্ময় নিয়ে তাকালো চিত্রলেখার মুখের দিকে।

চিত্রলেখা বললে, ভুলে গিয়েছিস, আজ ইন্দ্রলোকে লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটক অভিনীত হবে। এই অভিনয় দর্শনের জন্যে আচার্য ভরত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বর্গের সকল দেবদেবীগণকে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রানীসহ এই অভিনয় দর্শন করবেন। এবং শীর্ষ দেবতারাও আজ দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

উর্বশীর নয়নদ্বয় মুহূর্তে অশ্রুসিক্ত হলো। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে চিত্রলেখার নাম ধরে ডাকলো।

চিত্রলেখা বললে, মহারাজ নিশ্চয়ই বুঝবেন—তুই মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা কর।

পুরূরবা বললেন, কিসের অনুমতি ?

চিত্রলেখা বললে, স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার। মহারাজ তো জানেন আমরা অপ্সরা—দেবতাদের মনোরঞ্জন করাই আমাদের একমাত্র কাজ। দেবরাজ ইন্দ্রের অধীন আমরা—আমাদের স্বাধীনতা নেই। সুতরাং অচিরেই আমাদের স্বর্গলোকে ফিরে যেতে হবে। দেবরাজ স্বয়ং দূত পাঠিয়েছেন। অনুমতি দিন মহারাজ, সখিকে নিয়ে স্বর্গলোকে ফিরে যাই।

পুরূরবার মন মুহূর্তে বিষাদগ্রস্ত হলো। তবু নিজের মনের বল্‌গাকে শক্ত করে ধরলেন। বললেন, তোমাদের প্রভু আমার পরম সুহৃদ। আমি চাই না

তোমরা দেবরাজের আদেশ অমান্য করো। তোমরা স্বর্গলোকে ফিরে যাও। তবে একটা অনুরোধ এই মর্তবাসীকে যেন বিস্মৃত হয়ো না।

—আমার ওপর বিশ্বাস রাখবেন রাজর্ষি, বলে উর্বশী উঠে দাঁড়ালো। তার শরীর এখন কম্পমান। ঠিক মতো কথা বলতেও পারছে না সে। চিত্রলেখার হাত ধরে রথের দিকে এগিয়ে গেল। যাবার সময় বারবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকালো পুরূরবার মুখের দিকে।

পুরূরবা দেখলেন চিত্রলেখাকে নিয়ে আকাশ রথে অরোহণ করলো উর্বশী।

কিন্তু উর্বশীর দৃষ্টি তখনো পুরূরবার ওপর।

রথ এখন আকাশ পথে উড্ডীয়মান।

দেখতে দেখতে স্বর্গীয় রথ দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

পুরূরবা চুপচাপ বসে রইলেন উদ্যানের নিভৃত কোণে। বাতাসে এখনো উর্বশীর অঙ্গ গন্ধ মিশে আছে।

দু চোখ বন্ধ করলেন পুরূরবা। মনের মধ্যে উর্বশীর ছবিটা এখন স্পষ্ট।

বিরহজনিত যন্ত্রণার অনুভূতি এখন আর নেই। কিন্তু শরীর-মন জুড়ে গভীর অবসাদ।

হোক ক্ষণিকের, তবু উর্বশীর স্পর্শ তাঁকে স্বস্তি দিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়লো সেই ভূর্জপত্রটির কথা, যে ভূর্জপত্রে উর্বশী সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছিল রাজর্ষির উদ্দেশে।

কোথায় গেল সেই পত্রটি! পত্রটি যে রাজর্ষির কাছে মণিমুক্তার চেয়ে মূল্যবান।

তন্ন তন্ন করে ভূর্জপত্রটি খুঁজতে লাগলেন পুরূরবা। কিন্তু পেলেন না।

আবার বিদূষক এসে দাঁড়ালেন।

পুরূরবা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো বন্ধু সেই ভূর্জপত্রটি কোথায়?

বিদূষক বললেন, না সুহৃদ। তবে আমার মনে হয় বাতাসে উড়ে গেছে। ছোট এক টুকরো ভূর্জপত্র তো।

—একবার উদ্যানের চারদিক ভালো করে খুঁজে দেখো তো বিদূষক, পুরূরবা বললেন, ভূর্জপত্রটিতে যে তার হস্তাক্ষর রয়েছে।

কিন্তু ভূর্জপত্রটি কোথায় খুঁজে পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে রানীর সহচরী নিপুণিকা একবার উদ্যানে প্রবেশ করেছিল, সে-ও দেখে গেছে রাজর্ষি আর বিদূষক উদ্যান মধ্যে দিশেহারা হয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

নিপুণিকা গোপনে এসেছিল, গোপনেই চলে গেছে রানী ঔশীনরী সকাশে।

রানী ঔশীনরীই নিপুণিকাকে পাঠিয়েছিলেন উদ্যানে, রাজর্ষি কি করছেন দেখার জন্যে।

আপন কক্ষে রানী কিছুটা উন্মনা হয়েই বসেছিলেন। রাজর্ষির ভাবান্তর বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন রানী। রানীর মনের ওপরেও তাই চিন্তার ভার।

কিন্তু আজও পর্যন্ত রাজার ভাবান্তরের কারণ সূত্রটি তাঁর অজ্ঞাত।

নিপুণিকার অপেক্ষায় ছিলেন রানী। নিপুণিকা কক্ষে প্রবেশ করতেই রানী বললেন, মহারাজ কি এখনো উদ্যানেই বসে আছেন?

নিপুণিকা বললে, উদ্যানেই আছেন। দেখলাম বিদূষককে নিয়ে মহারাজা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ঔশীনরীর মুখের চিন্তার রেখা ফুটলো। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, চল তো নিপুণিকা—দেখে আসি।

নিপুণিকাকে নিয়ে রানী ঔশীনরী লোকচক্ষুর আড়াল দিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। লতাকুঞ্জের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন মহারাজ উদ্‌ভ্রান্তের মতো উদ্যানময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই সঙ্গে রাজর্ষির প্রিয় বিদূষকও রয়েছেন।

হঠাৎ নিপুণিকা এগিয়ে গেল। বাতাসে উড়ে আসা এক টুকরো ভূর্জপত্র কুড়িয়ে নিলে। দেখলো সুন্দর হস্তাক্ষর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত একটি পত্র।

পত্রখানি পাঠ করে নিপুণিকা চমকে উঠলো যেন। তার চোখ-মুখের চেহারাও বদলে গেল।

রানী কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন, কার চিঠি!

নিপুণিকা কথা না বলে ভূর্জপত্রটি এগিয়ে দিলে রানীর দিকে। রানী

পত্রটি পাঠ করে মনে মনে রীতিমতো বিচলিত হলেন, কিন্তু বাইরে থেকে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। অথচ মনের মধ্যে ঝড় উঠলো—দেবতুল্য স্বামীর একি পরিণতি! শেষটা স্বর্গের বারাঙ্গনার প্রতি প্রণয়াসক্ত হলেন!

নিপুণিকা বুঝতে পারছে রানীর মনের অবস্থা এখন কেমন। ভাবলো, এখন রানীকে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। এবং এখানে না থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।

নিপুণিকা পা বাড়াবার মুহূর্তেই শুনতে পেল রানীর ডাক।—নিপুণিকা যাচ্ছিস কোথায়?

—দেবী!

নিপুণিকার মুখে চোখে কান্নার রঙ। রাজর্ষির এই পরিণতি নিপুণিকাকেও ব্যথিত করেছে। সে তো এই রাজ-পরিবারেরই একজন।

রানী জিজ্ঞাসা করলেন, পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিস তো?

নিপুণিকা বললে, হ্যাঁ মহারানী। এখন একটা আমার মনে পড়ছে দেবী, অনুমতি করলে বলতে পারি।

—বল্ কি বলবি। রানী বললেন, আজ যে কোনো কথা আমি হাসি মুখে গ্রহণ করবো।

নিপুণিকা বললে, আমি কয়েকদিন আগে থেকেই কানাকানি শুনছিলাম, রাজর্ষি নাকি কেশী দৈত্যের কবল থেকে উর্বশী নাম্নী অপ্সরাকে উদ্ধার করেছিলেন। আর সেই দিন থেকেই নাকি রাজর্ষির হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার। তখন বিশ্বাস হয়নি দেবী।

—কিন্তু সে কথা বলিসনি কেন এতদিন?

—দেবী আমাকে মার্জনা করবেন, আমি বলতে সাহস করিনি। আর ভেবেওছিলাম, এ কথা মিথ্যা রটনা মাত্র। তাছাড়া ও কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করাও অসম্ভব ছিল। নিপুণিকা বললে, দেবী মহারাজের একি দুর্মতি হলো! শেষটা ছলনাময়ী অপ্সরার প্রতি প্রণয়াসক্ত হলেন!

—প্রণয় এমনই অন্ধ নিপুণিকা, রানী বললেন, সেখানে স্থান-কাল-পাত্র বলে কোনো কিছু নেই। যাক, এখন দেখ তো মহারাজ উদ্যানের কোথায় আছেন?

নিপুণিকা উদ্যানের চারদিক নিরীক্ষণ করে রানীর কাছে এলো। দেখলো রানীর চোখ অশ্রুসিক্ত এবং নিঃশ্বাস দ্রুত।

সভয়ে রানীর কাছে এসে দাঁড়ালো নিপুণিকা। বললে, রাজর্ষি এখন উদ্যানের প্রান্তদেশে আছেন।

রানী বললেন, আমি মহারাজের কাছে যাবো নিপুণিকা। এই ভূর্জপত্রটি তাঁর পদ প্রান্তে অঞ্জলি রূপে নিবেদন করে আমি স্বামী পূজা সমাপন করবো।

নিপুণিকা কেমন ভয় পেয়ে যায়। রানীর একি বিপরীত ইচ্ছা! কিন্তু রানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলাও তার পক্ষে অসম্ভব।

রানী বললেন, তুই এখানে অপেক্ষা কর—আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

ঔশীনরী দ্রুত পদক্ষেপে উদ্যান-পথে প্রাসাদের দিকে চললেন। নিপুণিকা আর কি করবে, সে লতাবিতানের আড়ালে, যেখানে অন্ধকার ঘন, সেখানে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আর লতাবিতানের অন্তরাল থেকে মাঝে মাঝে রাজর্ষিকে দেখতে লাগলো।

রাজর্ষি এখনো বিদূষককে নিয়ে উদ্যানের প্রতিটি কোণ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করছেন, আর বলছেন, আমার প্রিয়ার পত্রটি কোথায় গেল! সেই পত্রটি যে আমার প্রিয়া উর্বশীর লেখা। আমার বিরহকাতর হৃদয়কে সেই পত্রটি যে কত সান্ত্বনা দিত—তা আমি কাকে বোঝাবো।

উন্মাদের মতো রাজর্ষি উদ্যানের মধ্যে পদচারণা করছেন, আর একটি শুকনো পাতা কিংবা হংসের পরিত্যক্ত পালক দেখলেও কুড়িয়ে নিচ্ছেন, দেখছেন উর্বশীর সেই ভূর্জপত্রটি কি না।

রানী ঔশীনরী এখন পূজারিনীর বেশে এসেছেন। অঙ্গে রাজকীয় আবরণ নেই, আভরণ নেই—পরিধানে সুন্দর একটি পট্টবস্ত্র মাত্র।

রানী নয়, যেন কোনো দেবী প্রতিমা।

নিপুণিকা রানীকে এই বেশে দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

রানী বললেন, চল নিপুণিকা, আমার সঙ্গে চল।

নিপুণিকা নৃত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

রানী বললেন, কী হলো ! দুঃখটা আমার না তোর। জানিস নিপুণিকা স্বামী চিরদিনই স্বামী। সাধ্বী স্ত্রী নিয়তই স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। আয় আমার সঙ্গে।

নিপুণিকাকে নিয়ে ঔশীনরী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। রানীকে আসতে দেখে বিদূষক পুরূরবাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, মহারাজ দেবী আসছেন।

—দেবী ঔশীনরী !

বিদূষক ততক্ষণে আড়ালে চলে গেছেন।

পুরূরবা দেখলেন পূজারিনীর বেশে রানী ঔশীনরী আসছেন। সঙ্গে নিপুণিকা।

—দেবী !

কোনো কথা বললেন না ঔশীনরী। গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীকে প্রণাম করে, পায়ের কাছে ভূর্জপত্রটি রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

—দেবী ঔশীনরী !

—মহারাজের এ বিস্ময়সূচক সম্বোধন কেন ? ঔশীনরী বললেন, যে ভূর্জপত্রটির জন্য আপনার উন্মাদনা, সেই পত্রটি আপনার পদপ্রান্তে অঞ্জলি রূপে নিবেদন করেছি। হয়তো মহারাজ এবারে স্বস্তি বোধ করবেন।

—দেবী !

—এখনো দেবী সম্বোধন করতে পারছেন মহারাজা ! কে দেবী ? আমি না আর কেউ। মহারাজা আপনি যে এমন অভিনয় দক্ষ, তা আমি জানতাম না। যাক আমি যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা বলে যাই, মহারাজের সুখের পথে আমি কোনদিন বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। মহারাজ সুখী হলে আমি সুখী হবো।

বলে আর দাঁড়ালেন না ঔশীনরী। দ্রুত চলতে আরম্ভ করলেন নিপুণিকাকে নিয়ে। পুরূরবা বারবার 'দেবী, দেবী' বলে ডাকলেন, একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না ঔশীনরী।

বিদূষক এবারে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে

রসিকতা করে বললেন, রানী বোধহয় রাগ করেই চলে গেলেন। যাবেনই তো—পীড়িত চক্ষু কি কখনো আলোর উজ্জ্বল শিখা সহ্য করতে পারে!

বিদূষকের কথা শুনে পুরূরবা বিরক্ত হলেন। উর্বশীর প্রতি তিনি যতই প্রণয়াসক্ত হন, রানী ঔশীনরী এখনো তাঁর কাছে দেবী সদৃশা। বললেন, বিদূষক তুমি কি মনে করো দেবী ঔশীনরীর প্রতি আমার অনুরাগ নেই? যদি তা মনে করে থাকো, ভুল করেছো। দেবী দেবীই। তার প্রতি আমার হৃদয় আজও অনুরক্ত।

বিদূষক নীরব।

পুরূরবা বললেন, দেবী আমার ওপর অভিমান করে চলে গেল, তার দৃষ্টিতেও রোষবহ্নি প্রত্যক্ষ করলাম—তবু আমার পাটরানী আজও আমার কাছে দেবী প্রতিমার মতো।

পুরূরবা ভূর্জপত্রটি হাতে তুলে নিলেন। তাকালেন আকাশের দিকে। সূর্য এখন অস্তাচলমুখী।

পুরূরবা ভাবলেন, স্বর্গনটী অপ্সরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছে। এই মুহূর্তে পুরূরবা শুনতে পেলেন উদ্যানের একান্তে প্রমোদ কক্ষের অলিন্দ থেকে স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ শুক পাখিটি চিৎকার করছে।

প্রিয় পাখিটি হয়তো তৃষ্ণার্ত।

পুরূরবা মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন প্রমোদ কক্ষের দিকে।

স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ শুক পাখিটি পুরূরবাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কাছে গেলেন, শিস দিয়ে ডাকলেন, কিন্তু পাখিটি ফিরেও তাকালো না।

রানী ঔশীনরীর প্রিয় পাখি।

পুরূরবা ভাবলেন, পাখিটিও কি রানীর মতো অভিমান করেছে!

ক্লান্ত পদক্ষেপে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন পুরূরবা। তাকালেন প্রাসাদ শিখরের দিকে। যেখানে রাজকীয় পতাকা উড্ডীয়মান।

পুরূরবা লক্ষ্য করলেন, একটি শ্বেত পারাবত বসে আছে পতাকা দণ্ডের শীর্ষে।

রাজার মনে প্রশ্ন, শ্বেত পারাবতটি কোনো শুভবার্তা বহন করে আনেনি তো?

মর্তলোক থেকে আকাশ রথে আবার ইন্দ্রপুরীতে ফিরে এলো উর্বশী। ফিরে এসেছে এই পর্যন্ত—তার হৃদয়-মন রেখে এসেছে মর্তধামে।

কত আশা নিয়ে সে সখি চিত্রলেখা সহ রাজর্ষি পুরূরবা সন্নিধানে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল, পুরূরবাকে নিবিড় আলিঙ্গনে গ্রহণ করে বিরহতাপদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করবে। কিন্তু তা হলো কই!

কতটুকু সময়ই-বা থাকতে পেরেছিল হৃদয়েশ্বর পুরূরবার কাছে।

মিলন-সুখের মুহূর্ত কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

উর্বশী ভাবছে, এভাবে না গেলেই ভালো হতো। এই যাওয়া আসাতে তার মনে বিরহ অনল নতুন করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এতদিন যাও-বা সহনীয় মনে হতো, এখন অসহ্য মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেনই বা সে পুরূরবাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছিল। স্বর্গপুরে সে তো বেশ সুখেই ছিল। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যাঁর রূপ যৌবনের পূজারী—সেখানে মর্তবাসী রাজাকে ভালোবেসে নিজেকে দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত করলো কেন!

উর্বশী কিছুতেই তার অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারছে না। সে জানে, তাকে স্বর্গপুরেই থাকতে হবে। হতে পারে সে অনন্ত যৌবনা, হতে পারে সে সৌন্দর্য প্রতিমা—কিন্তু কী হবে সেই অনন্তযৌবন নিয়ে, কী হবে সৌন্দর্যে। স্বর্গপুরীতে কেউ তো তার ইচ্ছার মূল্য দেবে না। এখানে তো তার পরিচয় অপ্সরা রূপে। স্বর্গের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। সে নটী, দেবকুলের মনোরঞ্জন করাই তো একমাত্র কাজ। তার রূপ, তার যৌবন—এতো শুধু কামোন্মত্ত দেবচিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে। সে তো রূপ যৌবনের আধার মাত্র।

উর্বশীর ইচ্ছা হয়, স্বার্থপর স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু কী লাভ সে নিষ্ফল বিদ্রোহে। কতটুকু তার শক্তি। সে তো অপ্সরা ছাড়া আর কিছু নয়। চাতক হৃদয়ে দেবরাজ হয়তো তাকে কামনা করেন, কিন্তু সে তো সাময়িক মিলন সুখের জন্য। নয়তো ইন্দ্র তো চিরদিনই শচীপতি।

উর্বশীর ভাবনার যেন শেষ নেই। তার হৃদয় মথিত হচ্ছে দুঃখে বেদনায়। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়ছে।

চিত্রলেখা যদিও সমব্যথী তবু সে নির্মম সত্যকে মেনে নিয়েছে। উর্বশীকে সে বুঝিয়ে বললে, উর্বশী তুই এমন করে নিজেকে শেষ করিস নে। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ নেই। আমরা এই নন্দনের অলংকার মাত্র। বুঝতে পারি না, কেন তুই আত্মবিস্মৃত হয়ে মর্তবাসী রাজাকে হৃদয় নিবেদন করেছিলি! তুই তো জানিস স্বর্গ আর মর্তের মাঝে দুস্তর ব্যবধান।

—সত্যিই সেই মুহূর্তে কন্দর্পদেব আমাকে এমনই সম্মোহিত করেছিলেন, যে আমার চোখে তখন পুরূরবা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি ইন্দ্রসভার শোভাবর্ধনকারিণী অপ্সরা মাত্র, স্বাধীনতা আমাদের জন্য নয়।

উর্বশীর নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো।

চিত্রলেখা বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, একবার আত্মবিস্মৃত হয়ে রাজর্ষি পুরূরবাকে প্রেম নিবেদন করেছিস, কামনা করি, এবারে বিস্মৃতির কুহেলিকার অন্তরালে তোর পুরূরবা হারিয়ে যাক।

উর্বশী উতলা কণ্ঠে বললে, একথা বলছিস কেন সখি?

চিত্রলেখা বললে, বলছি অনেক দুঃখে। তোর এ প্রেমের মূল্য কে দেবে? স্বর্গের দেবকুল? অসম্ভব।

উর্বশী বললে, কিন্তু রাজর্ষি পুরূরবা ছাড়া আমার হৃদয়ে যে দ্বিতীয় কেউ নেই সখি।

চিত্রলেখা বললে, তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সখি। কিন্তু কি করবি বল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন আকাশের স্বপ্ন দেখে দিন কাটায়, তেমনি তোকেও সেই মর্তবাসীর রাজার স্বপ্ন দেখেই দিন কাটাতে হবে সখি। কি কুক্ষণে যে আমরা কেশী দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলাম।

উর্বশী বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

ইতিমধ্যে রম্ভা এসে উপস্থিত হলো। বললে, আচার্যদেব তোদের না দেখে ঈষৎ ক্রোধান্বিত হয়েছেন।

—তাই নাকি ! উর্বশী বললে, ক্রোধের কারণ কি সখি রম্ভা ?

—অভিনয় আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। অথচ তুই এখনো সাজ ঘরে যাসনি। আজকের নাটক তো তোকে নিয়েই। আচার্যদেব বলেছেন, আজ যে নাটক তিনি উপস্থাপনা করছেন—এটি তাঁর পরিচালনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। আর এ নাটক রচনা করেছেন—

—দেবী সরস্বতী। রম্ভার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উর্বশী বললে, নাট্যশাস্ত্রে যে আট প্রকার রসের কথা আছে, লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটকে দেবী সরস্বতী সেই আট প্রকার রসের অবতারণা করেছেন—এই তো ?

রম্ভা বললে, আর সময় নষ্ট করিস না সখি, আচার্যদেব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

উর্বশী বললে, চল—যাচ্ছি।

ইন্দ্রলোকের নাটমন্দির আজ অপরূপ সাজে সজ্জিত। লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটকের আজ উদ্বোধন রজনী। আচার্য ভরতের আজ ব্যস্ততার অন্ত নেই। স্বর্গের দেবদেবীরা আজ নাটক দেখতে এসেছেন।

নাটমঞ্চ সংলগ্ন সজ্জা গৃহের দ্বার প্রান্তে উদ্বিগ্ন ভাবে পদচারণা করছেন নাট্যাচার্য ভরত। প্রথমেই লক্ষ্মীরূপিণী উর্বশী এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলো।

আচার্য ভরত মুগ্ধ হলেন উর্বশীর রূপসজ্জা দেখে। বললেন, অভিনয় কালে তোমার অন্তরে লক্ষ্মী দেবী বিরাজ করুন।

—কিন্তু আমি যে উর্বশী গুরুদেব।

আচার্যের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। উর্বশী তো কখনো মুখের ওপর কথা বলে না, আজ বললো কেন ? তবে তার মনে কি অহংবোধ দেখা দিয়েছে !

—গুরুদেব যদি অন্যায় করে থাকি, আমাকে মার্জনা করবেন।

আচার্য মনে মনে খুশি হলেন। বললেন, উর্বশী মনে রেখো—দেবী সরস্বতী এই নাটক রচনা করেছেন আর নাটকের দর্শক আজ স্বর্গের দেব দেবীগণ। লক্ষ্মী নারায়ণও উপস্থিত থাকবেন। নাটকের সাফল্য নির্ভর করছে

তোমার অভিনয়ের ওপর।

—সব কিছু নির্ভর করছে আপনার আশীর্বাদের ওপর। বলে উর্বশী সজ্জাগৃহের ভিতরে গেল। যেখানে চিত্রলেখা ও অন্যান্য সখিরা বসে আছে।

উর্বশী আজ ক্লান্ত। কিছুটা উন্মনাও। সে চিত্রলেখার কানে কানে বললে, আমার কেমন যেন ভয় করছে সখি। তুই আমার বুকে হাত রাখ, বুঝতে পারবি বুকটা কেমন কাঁপছে। চিত্রলেখা, যদি সংলাপ ভুলে যাই! যদি নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়! যদি অভিনয়ে রসসৃষ্টি করতে না পারি!

—সখি উর্বশী, মনটাকে শক্ত কর।

—পারছি না রে।

পাশে এসে দাঁড়ালো বারুণী রূপিণী মেনকা। উর্বশী চুপ করে গেল।

মেনকা বললে, তোর চোখ দুটি দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস উর্বশী, মনে হচ্ছে ওই চোখে চুম্বন দিই।

হাসির ঝংকার উঠলো সজ্জাগৃহে।

আচার্য ভরত প্রবেশ করলেন সেই মুহূর্তে। সবাই চুপ করে গেল। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হয়ে আসছে, এবারে আরম্ভ হবে নাটক।

উর্বশী একবার সজ্জাগৃহের বাতায়ন পথে দর্শক আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। দর্শক আসন পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে স্বর্গের সকল দেব-দেবী উপস্থিত হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও শচীদেবী সম্মানিত অতিথিগণকে আপ্যায়িত করছেন। আর সদা-প্রফুল্ল দেবর্ষি নারদ প্রধান প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান।

নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হলো।

অসাধারণ নাটক, অসাধারণ অভিনয়।

উর্বশীর অভিনয়ে সমবেত দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে অভিভূত।

আচার্য ভরতের খুশির অন্ত নেই।

নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হলো।

চিত্রলেখা আনন্দে জড়িয়ে ধরলো উর্বশীকে। বললে, তোর অভিনয় দেখে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নত মস্তকে বসেছিলেন। উর্বশী তোর তুলনা তুই নিজে।

—কিন্তু সখি আমার ভয় করছে, ভাবছি শেষ রক্ষা করতে পারবো তো ?

সত্যি শেষ রক্ষা করতে পারলো না উর্বশী।

মঞ্চে বারুণী এবং লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশী আর বারুণীর ভূমিকায় অপ্সরা মেনকা। স্বয়ংবর সভায় যেখানে শীর্ষ দেবতারা উপস্থিত, বারুণী জিজ্ঞাসা করছে দেবী লক্ষ্মীকে, লক্ষ্মী—এখানে স্বয়ং নারায়ণ থেকে আরম্ভ করে সকল দেবতারা এই স্বয়ংবর সভায় সমবেত—এখন বলো তো তুমি হৃদয় দিয়ে কাকে ভালোবাসো ?

উর্বশী নিরুত্তর।

মেনকা ভাবলো, তবে কি উর্বশী নাটকের সংলাপ ভুলে গেছে।

নেপথ্যে ভরত রীতিমতো বিচলিত। তিনি বারবার পর্দার অন্তরাল থেকে বলছেন, বলো উর্বশী—আমি নারায়ণকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি।

কিন্তু উর্বশী তবু কিছু বলতে পারছে না।

মেনকা আবার জানতে চায়, তুমি হৃদয় দিয়ে কাকে ভালোবাসো ?

—আমি ভালোবাসি রাজর্ষি পুরূরবাকে।

ভরত ছুটে এলেন। একি করলে উর্বশী ! অভিনয় কালে সে মর্তবাসী রাজার নাম উচ্চারণ করে স্বর্গের অবমাননা ঘটালো। সমবেত দেবকুলও বিচলিত হলেন। কেউ কেউ আসন ত্যাগ করে উঠে গেলেন। দেবী সরস্বতী রীতিমত ক্রোধান্বিতা।

উর্বশী তখন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আচার্য ভরতের দু চোখে রোষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। এ অপমান, নাটকের প্রতি এই অমর্যাদা অসহনীয়। উর্বশী সমীপে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তুমি নাটকের অমর্যাদা করেছো, প্রকাশ্যে এইভাবে অভিনয় কালে মর্তবাসী রাজার নাম উচ্চারণ করে দেবলোককে অপমান করেছো—আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে তুমি স্বর্গভ্রষ্টা—স্বর্গ আর তোমার জন্যে নয়। যাও, এখনি স্বর্গলোক ত্যাগ করো।

উর্বশীর সারাদেহ কাঁপছে, দুটি চোখে জলের এমন ঢল নেমেছে, যে কাজল রেখা অবধি ধুয়ে যাচ্ছে। উর্বশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না দেখে চিত্রলেখা তাকে ধরে ফেললো। বললে, সখি, এ কি সর্বনাশ করলি তুই !

জলভরা দুটি চোখ তুলে তাকালো উর্বশী। বললে, আমাকে আচার্যের কাছে নিয়ে চল সখি। তাঁর চরণ স্পর্শ করতে না পারি—দূর থেকে প্রণাম করবো।

উর্বশীকে দেখে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন আচার্য ভরত। উর্বশী কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়ে বললে, আচার্য আপনার অভিশাপ আমার কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভরত কোনো কথা কানে নিলেন না, এমনকি উর্বশীর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। এখনো তাঁর অন্তরে রোষবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

—আমাকে একবার দেবরাজের কাছে নিয়ে চল সখি চিত্রলেখা।

ইন্দ্র চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা। তিনি ভাবছেন, উর্বশী বিহনে তাঁর প্রিয় নন্দনবন সৌন্দর্য হারাবে, মন্দার মালিকা তখন কার কণ্ঠের শোভা বর্ধন করবে, শচীপ্রিয় পারিজাত কুসুমও তো উর্বশীর কবরীতে স্থান পাবার জন্যে ব্যাকুল।

নিজের কথাও ভাবছেন ইন্দ্র। উর্বশী ছাড়া কে তাঁর হৃদয় রঞ্জন করবে, অমন কুন্দশুভ্র দেহকান্তি নিয়ে নৃত্যের ছন্দে কে এগিয়ে এসে সোমরস পাত্র তুলে দেবে হাতে। অমন মদিরেক্ষণা সুন্দরী তো ত্রিজগতে দুর্লভ।

উর্বশী বিহনে যে ইন্দ্রলোক অন্ধকার হয়ে যাবে।

—দেবরাজকে আমি প্রণাম জানাতে এসেছি।

ইন্দ্র ফিরে তাকালেন উর্বশীর মুখের দিকে। উর্বশীর নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত, তার বক্ষদেশ দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, তার বক্ষদেশের কঞ্চুলিকা অশ্রু বিন্দু পাতে সিক্ত—ইন্দ্রের হৃদয় অব্যক্ত ব্যথায় মথিত হলো।

উর্বশী আবার বললে, আমাকে বিদায় দিন দেবরাজ।

দেবরাজ ইন্দ্র তবু নীরব। কী যেন চিন্তা করছেন তিনি।

উর্বশী কিঙ্কিনীর ঝংকার তুলে দেবরাজের সামনে নত জানু হয়ে বসলো। বললো, দেবরাজ—আমি উর্বশী—আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আচার্যের অভিশাপে আমি স্বর্গভ্রষ্টা।

ইন্দ্র এবারে ধীরনম্র কণ্ঠে বললেন, আচার্য ভরতের অভিশাপ তো মিথ্যে

হবার নয় উর্বশী। তোমাকে মর্তধামে যেতেই হবে। আমি জানি, পুরূরবার প্রতি তোমার অনুরাগের কথা। রাজর্ষি পুরূরবা আমার পরম সুহৃদ। তুমি হৃষ্টচিত্তে রাজর্ষি পুরূরবাকে বরমাল্য অর্পণ করো।

উর্বশীর মন এই মুহূর্তে একদিকে স্বর্গবিরহে কাতর অন্যদিকে ঈপ্সিত মিলন-আনন্দের প্রত্যাশায় উন্মুখ। বললে, অপরাধ যদি করে থাকি—মার্জনা করবেন দেবরাজ।

ইন্দ্রের মন এখন আসন্ন উর্বশী বিরহে কাতর। বললেন, জানি আচার্যের অভিশাপে তোমায় মর্তধামে গমন করতে হবে, তবু আমি বলছি, তোমাকে আবার নির্দিষ্ট সময় শেষে স্বর্গলোকে ফিরে আসতে হবে।

উর্বশী তাকালো দেবরাজের মুখের দিকে।

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, রাজর্ষির ঔরসে তোমার গর্ভে এক বীর সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। রাজর্ষি যে দিন আপন সন্তানের মুখ দেখবেন, সেদিনই তোমাকে মর্ত থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গলোকে ফিরে আসতে হবে।

উর্বশীর কিছু বলার বাসনা ছিল, কিন্তু তাকে কোনো কথা বলার অবসর দিলেন না ইন্দ্র। বললেন, ইন্দ্রবাক্য কখনো মিথ্যে হয় না উর্বশী। যাও, এখন মর্তলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

উর্বশীর হৃদয়ে এই মুহূর্তে যত বেদনা তত আনন্দ। স্বর্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে সে—তার অনন্ত সুখের লীলা নিকেতন এই স্বর্গধাম। নন্দন বনের প্রতিটি বৃক্ষ-লতা তার কত না প্রিয়। কিন্তু তাকে সবই ছেড়ে যেতে হবে। ছেড়ে যেতে হবে প্রিয় অপ্সরাগণকে---যারা ছিল তার নিত্যসঙ্গিনী।

স্বর্গ এখন থেকে তার কাছে শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে। হয়তো মর্তলোকে চরম সুখের মুহূর্তে সে স্বর্গ-স্মৃতির দংশন জ্বালা অনুভব করবে।

উর্বশী নন্দন বনে গেল সখি চিত্রলেখাকে নিয়ে। প্রিয় বৃক্ষ-লতাদিকে চুম্বনে নিসিক্ত করলো। গেল সখি অপ্সরাগণের কাছে। বিদায়ের প্রাক্কালে সে সকলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা প্রার্থনা করলো।

বিদায়ের মুহূর্তে স্বর্গকে যেন আগের চেয়ে আরো বেশি ভালো লাগছে।

কিন্তু আর তো সময় নেই। এবারে তাকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হবে।

আজ আর নতুন করে সাজতে হলো না তাকে। লক্ষ্মীর রূপসজ্জায় সজ্জিতা যে—নতুন করে সাজার আর কি আছে তার।

শুধু চিত্রলেখাকে বললে, তুই আমার সঙ্গে যাবি তো চিত্রলেখা!

চিত্রলেখা হাসলো।

—হাসছিস যে?

উর্বশীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো চিত্রলেখা। বললে, সখি উর্বশী—হাসছি বড় দুঃখে।

—কিসের দুঃখ তোর?

—তাও বলে দিতে হবে। থাক, এখন থাক ওসব কথা।

কথার শেষে বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো চিত্রলেখা। বললে, চল—তোকে তোর দয়িতের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উর্বশীকে নিয়ে চিত্রলেখা রথে আরোহণ করলো। চন্দ্রিকাবিধৌত আকাশ পথে স্বর্গরথ ছুটে চললো মর্তধামের পথে।

উর্বশীর মন এই মুহূর্তে স্বর্গ বিরহে কাতর।

বিরহ কাতর হৃদয়ে রাজর্ষি পুরূরবা প্রমোদ নিকেতন মণিহর্ম্যের নিভৃত কক্ষে উর্বশীর চিন্তায় মুহূর্ত যাপন করছেন। দৃষ্টি তাঁর বাতায়ন পথে বাইরের দিকে। স্ফটিক জ্যোৎস্নার কিরণচ্ছটা বাতায়ন পথে কক্ষ অভ্যন্তরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

পুরূরবার হৃদয় এখন উর্বশী চিন্তায় বিভোর। দু-চোখ বন্ধ করে ভাবছেন সেদিনের কথা, যে দিন তিন উর্বশীকে প্রথম দেখলেন। সেই অনিন্দিত দেহকান্তির কথা কখনো বিস্মৃত হবার নয়।

রাজর্ষি এবারে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা, অলিন্দদেশে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রির শোভা নিরীক্ষণ করবেন। তাতে যদি বিরহযন্ত্রণার উপশম হয়।

কক্ষের বাইরে যাওয়া হলো না পুরূরবার—দেখলেন রানী সখিপরিবৃতা

হয়ে অলিন্দ পথে এই দিকে আসছেন।

রানী ঔশীনরী আসছেন পূজারিনীর বেশে। সখিবৃন্দের হাতে নানাবিধ পূজা উপচার।

এতো মন্দিরের পথ নয়, পুরূরবার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার হলো, রানী পূজা উপচার নিয়ে এদিকে আসছেন কেন!

পুরূরবার মুগ্ধ দৃষ্টি রানীর সুন্দর মুখের ওপর। রাজর্ষি ভাবছেন, তবে কি রানী ক্রোধ, অভিমান ত্যাগ করেছে!

রাজর্ষির অন্তরে এখন আনন্দ শিহরণ। ভাবছেন, রানী মানবী নয়—দেবী। কী অপূর্ব শ্রী মণ্ডিত মুখমণ্ডল, কী স্নিগ্ধ দৃষ্টি!

রানীকে দেখে নতুন করে প্রণয়রাগের সঞ্চার হচ্ছে রাজর্ষির হৃদয়ে।

এত রূপ রানীর! সাধিকার সাজে সজ্জিতা রানী—অঙ্গে কোনো আভরণ নেই, প্রসাধন নেই, শুধু ললাটদেশে সিন্দুর বিন্দু, শিথিল কবরীতে একটি মাত্র শুভ্র পুষ্প আর রক্তিম সীমন্তদেশে এক গুচ্ছ দূর্বা—তবু মনে হয় রানীর এ রূপের তুলনা নেই!

রাজর্ষির হৃদয়ে এখন অপার আনন্দ—উর্বশী বিরহজনিত ব্যথার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই।

রানী ঔশীনরী ধীর পদক্ষেপে যত কাছে এগিয়ে আসছেন, রাজর্ষির হৃদয় তত আনন্দ-প্লাবিত হচ্ছে।

—রাজর্ষির জয় হোক।

—দেবী!

—দেবী নয় রাজর্ষি, মানবী। রানী বললেন, আমি এসেছি আপনার চরণে আমার অঞ্জলি নিবেদন করতে।

—কিন্তু হঠাৎ এ বেশে কেন?

—এ আমার ব্রতচারিণীর বেশ।

—ব্রতচারিণীর বেশ! তুমি ব্রত পালন করছো, কি সে ব্রত?

—প্রিয় প্রসাদন। আপনি উপবেশন করুন মহারাজ।

আসনে উপবেশন করলেন রাজর্ষি পুরূরবা। রানী ঔশীনরী বসলেন রাজার সামনে। পাশে প্রিয় সখি ও পরিচারিকাবৃন্দ।

রাজর্ষি মুগ্ধ দৃষ্টিতে রানীকে দেখছেন। রানী নয়, যেন স্বর্গের দেবী।

আকাশ রথ থেকে অবতরণ করে উর্বশী ও চিত্রলেখা এসে পৌঁছলো মণিহর্ম্যের অলিন্দপ্রান্তে। দু জনেই তিরস্করিণী আচ্ছাদনের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে।

উর্বশী দেখলো রাজর্ষির কাছে এসেছেন রানী ঔশীনরী। রাজর্ষি সানন্দে রানীর দেওয়া পুষ্পহার কণ্ঠে ধারণ করলেন। আর রাজর্ষিকে দেখে এখন মনে হয় না যে, তিনি মদনবাণে জর্জরিত। তবে কি রাজর্ষি তাঁর প্রণয়িনীকে বিস্মৃত হয়েছেন ?

উর্বশীর হৃদয়ে এক নতুন দুশ্চিন্তা দেখা দিল। ভাবলো, অদৃষ্টের একি ছলনা—দেখে মনে হচ্ছে, রাজর্ষির হৃদয়ে একমাত্র রানীরই আসন পাতা।

চিত্রলেখা বুঝতে পেরেছে সখির মনের কথা। বললে, কি হলো—কি ভাবছিস ?

উর্বশী বললে, সখি কি আর বলবো। দেখছিস তো, রানীর প্রতি রাজর্ষির কি গভীর প্রেম। কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না—তবে কি রাজর্ষির সঙ্গে মিলন-সুখ আমার ভাগ্যে নেই।

চিত্রলেখা বললে, প্রেমে পড়লে বিচার বুদ্ধিও হারিয়ে যায়। সখি উর্বশী, তুই কি জানিস না, যে সকল নায়ক অন্যনায়িকায় আসক্ত, তারা আপন স্ত্রীর প্রতি বেশি অনুরাগ দেখায়। রাজর্ষি এখন ভালোবাসার অভিনয় করছেন। ভালো করে লক্ষ্য কর, বুঝতে পারবি।

—তোর কথাই যেন সত্যি হয় চিত্রলেখা। উর্বশী বললে, কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে। আচার্য ভরতের অভিশাপকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছি। আর তখন থেকে একটা চিন্তাই আমার মনে, কতক্ষণে রাজর্ষির সঙ্গে মিলিত হবো, মন্দারমালিকা দিয়ে পতিত্বে বরণ করবো সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরকে! কিন্তু কি জানি কেন, মনে হচ্ছে আমার আশা কুসুম বোধহয় প্রস্ফুটিত হবে না। আবার আরো একটা চিন্তা আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধও জাগ্রত হচ্ছে, মনে হচ্ছে দেবী সদৃশা ওই রানীর হৃদয়কে শূন্য করে আমি কি সুখ পাবো ?

সখি চিত্রলেখা, সুখ বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই। মনে হচ্ছে, প্রেম শুধু দুঃখই দেয়।

চিত্রলেখা বললে, তুই না অপ্সরা—তুই না নৃত্যগীত পটিয়সী স্বর্গনটী! এ চিন্তা তোর আমার জন্য নয় সখি।

রাজর্ষি পুরূরবার কোনো কথাই কানে নিলেন না ঔশীনরী। রাজর্ষি বারবার অনুনয় জানিয়ে বললেন, দেবী—আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী—এসো, এই রাত্রিটিকে উপভোগ করি। তোমার সহচরীরা চলে যাক—এসো তুমি আর আমি প্রমোদ উদ্যানে মধুযামিনী যাপন করি। তুমি আজ আমার কাছে নতুন রূপে দেখা দিয়েছো।

রাজর্ষির কথা রানী শুনলেন এই পর্যন্ত, কোনো কথাই বললেন না। রাজর্ষিকে আরো একবার প্রণাম জানিয়ে সহচরীগণকে সঙ্গে নিয়ে মণিহর্ম্য ত্যাগ করলেন।

রাজর্ষি পুরূরবা আবার উর্বশী চিন্তায় বিভোর হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই মুহূর্তে যদি নিঃশব্দ চরণে উর্বশী এসে দাঁড়ায়!

চিত্রলেখা যেন বুঝতে পেরেছে রাজর্ষির মনের কথা। বললে, ওলো উর্বশী—এবারে চল, রাজর্ষির কাছে যাই।

উর্বশী বললে, আমার ভয় করছে। বুকে হাত দিয়ে দেখ—বুকটা কেমন কাঁপছে।

চিত্রলেখা বললে, ওটা রাজর্ষিকে বলিস। সুন্দরীর বক্ষ-স্পন্দন প্রেমিক রাজর্ষি ভালোই অনুভব করবেন। যাক, তুই এখানে তিরস্করিণী আচ্ছাদনের আড়ালে আত্মগোপন করে থাক, আমি রাজর্ষির কাছে যাই। ভয় নেই—তোর রাজর্ষির ওপর আমার কোনো লোভ নেই।

চিত্রলেখা তিরস্করিণী আচ্ছাদন-মুক্ত হয়ে মঞ্জীর ধ্বনি তুলে রাজর্ষির সামনে এসে দাঁড়ালো। রাজর্ষি ভাবলেন, নিশ্চয়ই উর্বশী এসেছে।

কিন্তু উর্বশী নয় চিত্রলেখা।

—তুমি! পুরূরবা যেন হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

—হ্যাঁ মহারাজ। চিত্রলেখা বললে।

—কিন্তু তুমি একাকিনী কেন!

সহসা মঞ্জীর ধ্বনি শুনে উৎকর্ণ হলেন রাজর্ষি। চিত্রলেখা তো স্থির দাঁড়িয়ে আছে, তবে এ মঞ্জীর ধ্বনি আসছে কোথা থেকে। মন্দার পরিজাতের সুগন্ধও ভেসে আসছে, চিত্রলেখার কণ্ঠে তো মন্দারমালিকা কিংবা পরিজাত কুসুমও নেই—তবে সুরভির উৎস কোথায়!

—তোমার প্রিয় সখি কি তোমার সঙ্গে এসেছে চিত্রলেখা? পুরূরবা বললেন, যদি এসে থাকে, বলো সে কোথায়?

চিত্রলেখা বুঝতে পারে রাজর্ষির চিত্ত এখন রতি-রসে উদ্বেল। রাজর্ষির পাশে নিবিড় হয়ে বসে বললে, আমি আমার কথাই জানি রাজর্ষি।

পুরূরবা বিচলিত হয়ে উঠলেন। এখনো কানে আসছে সুমধুর মঞ্জীর ধ্বনি, এখনো নিঃশ্বাসে স্বর্গীয় কুসুমের গন্ধ অনুভব করছেন। ছলনায় দক্ষ স্বর্গ-অপ্সরাগণ—হয়তো উর্বশী তাঁকে ছলনা করছে!

—প্রিয় উর্বশী, কোথায় তুমি!

সহসা যেন বিস্ময়ের দ্বার উন্মুক্ত হলো। জ্যোৎস্নাময়ী উর্বশী চোখের সামনে। লক্ষ্মীর রূপসজ্জায় তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাজর্ষির হৃদয় এখন রতি-রসে এমনই উদ্বেল, তিনি ভুলে গেলেন চিত্রলেখা এখানে উপস্থিত—উর্বশীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে চুম্বনে জর্জরিত করলেন তার রক্তিম অধর। আর এই মুহূর্তে উর্বশীও নিজেকে সমর্পণ করেছে পুরূরবার ইচ্ছার কাছে।

চিত্রলেখার মুখে মৃদু হাসি। সে চটুল সুরে বললে, জানি না রাজর্ষির কানে আমার কথা পৌঁছবে কিনা, তবু বলছি—রাজর্ষির আছে আমার একটি অনুরোধ, দেখবেন স্বর্গের চিন্তায় সখির মনে যেন উৎকণ্ঠা না জাগে। আপনার প্রেমে ও যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

রাজর্ষি পুরূরবা শুধু একবার নয়নপাত করলেন চিত্রলেখার প্রতি।

চিত্রলেখা এবারে উর্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করলো। রাজর্ষির দেহ সান্নিধ্যে সখি উর্বশীর কোমল-তনু কেঁপে কেঁপে উঠছে। সখি উর্বশীর কানেও হয়তো তার কথা পৌঁছবে না। তবুও বললে, সখি উর্বশী—আমি চললাম।

উর্বশী কথা বলা দূরে থাক, একবার ফিরেও তাকালো না।

চিত্রলেখা আবার বললে, ওলো প্রিয় সখি উর্বশী—আমি চললাম।

উর্বশী এবারে ফিরে তাকালো চিত্রলেখার মুখের দিকে। অমুচ্চকণ্ঠে বললে, আমার প্রিয় সখিদের বলিস, আমি এখান থেকে প্রতিনিয়ত তাদের মঙ্গল কামনা করবো।

চিত্রলেখার দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। পুরূরবাকে অনুনয় জানিয়ে বললো, রাজর্ষি সখি আমার বড় অভিমানিনী—দেখবেন ও যেন ব্যথা না পায়।

মুহূর্তে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল চিত্রলেখা।

রাজর্ষি এবারে উর্বশীকে আরো নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এতদিনে আমার জীবন ধন্য হলো। সুরসুন্দরী আজ একান্তভাবে আমার। আজ আমার হৃদয় পূর্ণ হলো। আমার হৃদয় তোমার বিরহে এতদিন উষর মরুভূমি হয়ে ছিল—এতদিনে মরু হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটলো।

উর্বশী নীরব। তার দু চোখে জল টলমল করছে।

পুরূরবা বললেন, তোমার চোখে জল কেন সুন্দরী?

উর্বশী অর্ধফুট কণ্ঠে বললে, সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

পুরূরবা স্পর্শ করলেন উর্বশীর চিবুক। তারপর উর্বশীর মসৃণ বস্ত্রাঞ্চল দিয়েই মুছিয়ে দিলেন তার চোখের জল।

উর্বশীর মুখখানি নত-বৃন্ত পুষ্পের মতো নুয়ে পড়লো পুরূরবার প্রশস্ত বক্ষদেশে।

পুরূরবার মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা, যেদিন তিনি প্রথম দেখেছিলেন দৈত্য কর্তৃক নিগৃহীতা উর্বশীকে। প্রথম দর্শনের মুহূর্তেই তাঁর হৃদয় মদন বাণে বিদ্ধ হয়েছিল। তারপর উর্বশী চলে গেল স্বর্গপুরে, সেই থেকে প্রতিনিয়ত বিরহ অনলে দগ্ধ হয়েছে তাঁর হৃদয়। রাজকার্যে মন ছিল না, তারপর না ছিল আহার বিহারে রুচি, না ছিল নিদ্রা। কী ভাবে যে দিন কেটেছে তা অকল্পনীয়। হৃদয় প্রতিমা রানী ঔশীনরীর সান্নিধ্যও তাঁর ভালো লাগতো না।

আজ উর্বশীকে পেয়ে পুরূরবার হৃদয়-মন তৃপ্ত, শান্ত। তাপদগ্ধ ধরিত্রী

যেমন বর্ষণে শান্ত হয়। পুরূরবার হঠাৎ কি খেয়াল হলো, উর্বশীর কোমল তনু দু হাতে তুলে নিয়ে চললেন প্রমোদ কক্ষের দিকে।

আর উর্বশীর চেতনা এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে নবীন মিলন মুখে।

কক্ষে প্রবেশ করে পুরূরবা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, পালঙ্ক শয্যায় অজস্র ফুল ছড়ানো। একটু অবাক হলেন তিনি। কে এমন কুসুম শয্যা রচনা করে রেখেছে!

পুষ্পনিন্দিত উর্বশী এখন কুসুম শয্যায় শায়িতা। পালঙ্ক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পুরূরবা দৃষ্টি দিয়ে সম্ভোগ করতে লাগলেন উর্বশীর রূপ যৌবন। নারায়ণের উরু সম্ভবা উর্বশী আজ একান্তভাবে তাঁর—এর চেয়ে আনন্দের কি আছে।

উর্বশীর ললাটদেশে হাত রাখলেন পুরূরবা। বললেন, এত দিন ছিল বিরহের রাত, মনে হতো একটি রাত যেন একটি যন্ত্রণাময় যুগ, কিন্তু আজ প্রথম মিলনের রাত, এ রাত যেন দীর্ঘতম হয়।

—কিন্তু প্রিয়, সূর্যদেব তো অপেক্ষা করবেন না, মৃদু হেসে পুরূরবাকে দুহাতে আকর্ষণ করলো উর্বশী।

প্রমোদ কাননে তখন বসন্তের কোকিল ডাকছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। মণিহর্ম্যের স্ফটিকচূড়া এখনই ঝলঝল করে উঠবে প্রথম সূর্যের আলোর স্পর্শে। এখনই রাজপ্রাসাদের বন্দিগণ ভৈরবী রাগে গান আরম্ভ করবে।

পুরূরবার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম-ভাঙা চোখে তিনি দেখছেন উর্বশীকে।

উর্বশী এখনো গভীর ঘুমে অচেতন। দীর্ঘ ক্ষণের রতিক্রীড়ায় হয়তো ক্লান্ত সে।

উর্বশীর বেশ-বাস এখন অবিন্যস্ত, বক্ষদেশের কাঁচুলি বন্ধন শিথিল, কণ্ঠের ছিন্ন মন্দারমালিকা পড়ে আছে অলক্তরঞ্জিত চরণ যুগলের ওপর। রজত নূপুর স্থানচ্যুত হয়েছে, মণিমুক্তাখচিত বৈজয়ন্তী হার কবরীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

পুরূরবা নিদ্রিত উর্বশীর সৌন্দর্য সুধা পান করছেন। চোখের পিপাসা মেটে তো মন ভরে না, মন ভরে তো চোখের পিপাসা মেটে না

রাত শেষ হয়ে এলো। খোলা বাতায়ন পথে আলোর ইশারা। বন্দিগণের সুললিত কণ্ঠের গানের সুর ভেসে এলো।

আলোর স্পর্শে যেমন পদ্মকলি উন্মোচিত হয়, তেমনি উর্বশীর পদ্ম নিন্দিত নয়ন পল্লব উন্মীলিত হলো।

উর্বশীর কোমলতনু সারা রাত মর্তবাসী রাজার প্রেম পীড়ন সহ্য করেছে, এখনো দেহ জুড়ে তার অবসাদ। তবু উঠে বসলো উর্বশী। কিঙ্কিণী ঝংকৃত হলো, ঝংকৃত হলো নূপুর। শিথিল কবরী থেকে মুক্ত হলো বৈজয়ন্তী হার ছড়াটি। বললে, মর্তের প্রথম মধুযামিনী শেষ হলো রাজর্ষি। যে রাতটি চলে গেল এ রাতটির কথা কোনোদিন বিস্মৃত হবো না। একটা রাত যেন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল রাজর্ষি।

পুরূরবা বললেন, আমাদের প্রেমের স্বপ্ন যেন কখনো শেষ না হয় উর্বশী।

উর্বশীর ভাবান্তর ঘটলো। তার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পুরূরবা লক্ষ্য করলেন উর্বশীর ভাবান্তর। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মুখে হঠাৎ চিন্তার রেখা ফুটলো কেন প্রিয়তমা?

উর্বশী হাসলো। বিলম্বিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, স্বপ্নের কথা বলছো কেন স্বামী—স্বপ্ন যে চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী।

পুরূরবা এখন একটি সহজ সত্যের মুখোমুখি—সত্যি, স্বপ্নের মুহূর্ত স্বপ্নের মধ্যেই হারিয়ে যায়।

উর্বশী বললে, কি হলো তোমার!

পুরূরবা বললেন, কিছু না উর্বশী। চলো, আমরা অলিন্দে যাই।

—চলো। উর্বশী অবিন্যস্ত বেশ-বাস গুছিয়ে নিলে। বললে, আমাকে লোকচক্ষুর সামনে দাঁড় করাতে তোমার কোনো সংকোচ নেই তো?

—উর্বশী, এখন তো কারো অজানা থাকবে না, যে সুরলোকের অন্যতমা অপ্সরা, নারায়ণের উরুসম্ভবা উর্বশী আমার স্ত্রী।

—জানি না, দেবী ঔশীনরী আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন?

—সত্যিই সে দেবী, তার একমাত্র চিন্তা স্বামীর সুখ।

—দেবীকে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করছে স্বামী।

—বেশ তো, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। চলো—অলিন্দে যাই।

অলিন্দদেশ থেকে দেখা যায় গঙ্গা যমুনার সঙ্গমক্ষেত্র।

উর্বশীকে নিয়ে পুরূরবা অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। দুজনেরই দৃষ্টি সঙ্গমক্ষেত্রের দিকে। মুগ্ধ উর্বশী। বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি?

—মনে হচ্ছে আমি ইন্দ্রলোকেই আছি।

—যদিও এখানে ইন্দ্র নেই।

—তুমিই আমার ইন্দ্র। যে ইন্দ্র একান্তভাবে আমার।

অলিন্দদেশ থেকে দু জনেই দেখলেন, পূজারিনীর বেশে রানী ঔশীনরী সখি সহচরী পরিবৃতা হয়ে সঙ্গম ক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছেন।

গঙ্গা পূজায় চলেছেন রানী ঔশীনরী। উর্বশী যুক্ত করে রানীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলো।

এক একটা করে দিন চলে যায়। রাজর্ষি পুরূরবা দিন রাত উর্বশীকে নিয়েই মেতে আছেন। উর্বশী ছাড়া তাঁর যেন আর কিছু নেই।

পুরূরবা ভুলে গেছেন তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর—রাজ্যের গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। দিন রাত উর্বশীকে এমনই মত্ত, এর মধ্যে একদিন রাজসভাতে যাওয়ারও সময় হয়নি তাঁর।

উর্বশী বারবার বলেছে, রাজকার্যে রাজার এ শৈথিল্য সাজে না। তুমি রাজা—প্রজাহিতৈষী বলে রাজ্যের সর্বত্রই তোমার নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়—সুতরাং রাজ্য আগে, পরে আমি।

কিন্তু পুরূরবার কথা, কি হবে রাজত্ব—তুমিই আমার কাছে সব।

এরপর উর্বশী আর কথা বাড়ায়নি। জানে, রাজার প্রেমোন্মাদনা এখনও কাটেনি।

উর্বশী চিন্তিত হলো। ভাবলো, রাজা যদি রাজধর্ম বিসর্জন দিয়ে তাকে নিয়ে কালাতিপাত করেন, তাহলে মর্তবাসী তাকেই দোষারোপ করবে। এর চেয়ে ভালো কিছুদিনের জন্যে মন্ত্রীবর্গের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে রাজর্ষিকে নিয়ে কোথাও প্রমোদ-ভ্রমণে যাওয়া। তাতে রাজার প্রেমোন্মাদনার হয়তো উপশম হবে। প্রেমের খেলা খেলতে খেলতে হয়তো

একদিন রাজর্ষির মনে অবসাদ আসবে।

একদিন সে রাজর্ষিকে তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বললে, প্রিয় স্বামী—চলো কিছুদিনের জন্য এমন কোথাও যাই, যেখানে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ণ হবে মিলনের আনন্দে।

রাজর্ষি উৎফুল্ল চিত্তে বলে উঠলেন, তাই চলো। কিন্তু—

উর্বশী বললে, কোনো কিন্তু নেই। মন্ত্রীবর্গের হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দাও—আর তুমি তো চিরদিনের জন্য যাচ্ছো না।

—কিন্তু কোথায় যাবে।

—গন্ধমাদন পর্বতের রমণীয় উপত্যকায়। যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। যেখানে অজস্রফুলের সমারোহ, যেখানে বিদ্যাধর, বিদ্যাধরীগণ প্রায়শঃ পরিভ্রমণ করতে আসে। আর মন্দাকিনীর তীরভূমির সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তুমি আর আমি সেখানে স্বর্গ রচনা করবো, যেখানে শুধু মিলন আর মিলন।

পুরূরবা বললেন, এত ভালোবাসা আমার সহ্য হবে তো?

উর্বশী বললে, আমাদের এ প্রেম অনির্বাণ দীপ শিখার মতো।

পুরূরবা এর পরই উর্বশীর অধরে চুম্বন দিয়ে বললে, তবু ভয় হয়, যদি প্রলয়ংকরী ঝড়ে সে দীপ নিবে যায়!

উর্বশীর মনেও এই মুহূর্তে অন্য এক চিন্তা। মনে পড়ছে আচার্য ভরতের অভিশাপের কথা, যে অভিশাপ তার কাছে ছিল আশীর্বাদ।

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী?

সে তো মিথ্যে হবার নয়। একদিন আবার তাকে ফিরে যেতে হবে স্বর্গলোকে।

কিন্তু যদি সে জননী না হয়! কিংবা যদি রাজর্ষি আপন পুত্র মুখ দর্শন না করেন—তাহলে তো ইন্দ্রের ইচ্ছা পূরণ হবে না।

—কি ভাবছো উর্বশী! স্বর্গের কথা?

—না। উর্বশী বললে, স্বর্গের প্রতি আর কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না। তবে আমার প্রিয় সখিদের জন্যে মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হয়, বিশেষ করে চিত্রলেখার জন্যে। যে ছিল আমার ছায়াসঙ্গিনী।

রাজর্ষির তবু মনে হয়, উর্বশী মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন—একথা জানতে চাইলেই উর্বশী বলে, স্বামী এ তোমার দৃষ্টি বিভ্রম। আমার হৃদয়-মন তো মহারাজের কাছে চিরদিনের জন্যে গচ্ছিত। এখানে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়?

আজও পর্যন্ত উর্বশী বলেনি আচার্য ভরতের অভিশাপ আর ইন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। তবে রমণ-ক্রীড়ার চরম মুহূর্তে উর্বশী নিজেকে স্বামীর শরীর সান্নিধ্য থেকে বারবার নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। উর্বশী চায় না রাজর্ষির বীর্যে সে সন্তানসম্ভবা হোক।

কিন্তু অপুত্রক পুরূরবা মনে প্রাণে কামনা করেন, উর্বশীর গর্ভে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করুক। চন্দ্রবংশের ধারা অব্যাহত থাকুক।

শুভদিন থেকে মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে মিলিত হলেন পুরূরবা। আপন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। জানালেন, কিছুকাল পরেই তিনি আবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। তাঁর এই সাময়িক অনুপস্থিতির সময়টুকু যেন রাজর্ষি-নির্দেশিত পথে মন্ত্রীবর্গ রাজ্য পরিচালনা করেন।

মন্ত্রীবর্গ রাজার ইচ্ছায় বাদ সাধলেন না। কিন্তু প্রিয় বিদূষক রাজর্ষিকে সঙ্গোপনে ডেকে বললেন, রাজর্ষি কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলেছেন? আপন চিত্তবিনোদনের চিন্তাটাই কি রাজ্য চিন্তার চেয়ে বড় হলো! প্রজাপালনই রাজার ধর্ম। একজন অপ্সরার জন্যে রাজর্ষি কি আপন পৌরুষ জলাঞ্জলি দিতে চলেছেন?

স্থিতধী রাজা পুরূরবা। বিদূষকের কথায় বিন্দুমাত্র উষ্মা প্রকাশ করলেন না। বরং বিদূষকের করমর্দন করে বললেন, তোমার কথা আমার মনে থাকবে সুহৃদ।

বিদূষক আরো বললেন, রাজর্ষি কি দেবীসদৃশা রানীর কথাও একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন?

পুরূরবা এবারে বিচলিত হলেন। বললেন, না সুহৃদ—আমার হৃদয় তো প্রস্তর-হৃদয় নয়, যে রানীকে বিস্মৃত হবো।

বিদূষক বললেন, এরপর আমার আর কিছু বলার নেই রাজর্ষি। তবু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রাজর্ষি যেন আত্মবিস্মৃত না হন।

বিদূষক চলে গেলেন। পুরূরবা কিছুক্ষণ সভাকক্ষের একান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মন্ত্রীবর্গের কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা আরো একবার ব্যক্ত করে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হলেন রানী ঔশীনরীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

কৃষ্ণপক্ষের দিন শেষ হলে শুভদিনে উর্বশী সহ রাজর্ষি মধুযামিনী যাপনের উদ্দেশ্যে গন্ধমাদন পর্বতে যাত্রা করলেন। যাত্রার মুহূর্তে দেবী ঔশীনরী ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে স্বামী এবং সপত্নী উর্বশীর ললাটে হাসিমুখে মঙ্গল চিহ্ন এঁকে দিলেন।

দেবী ঔশীনরীকে প্রণাম করে উর্বশী রথে আরোহণ করলেন।

উর্বশীসহ পুরূরবা আজই প্রথম জনসমক্ষে এসেছেন। এতদিন উর্বশীর কথা সকলেই শুনেছেন, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য কারো হয়নি। সৌন্দর্যময়ী উর্বশীকে দেখে সকলেই মুগ্ধ। সেই সঙ্গে চিন্তিতও। পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় আত্মাহুতি দেয়, শেষটা রাজর্ষির জীবনেও না অনুরূপ অবস্থা ঘটে। কিন্তু একথা প্রকাশ্যে বলার ক্ষমতা কারও নেই। অথচ রাজর্ষির হিতৈষীজনের মনে এক চিন্তা—যে রাজা নিয়ত রাজ্যের এবং প্রজাকুলের কল্যাণ-চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন, শেষটা তিনি স্বর্গনটীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হলেন।

রাজর্ষি প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। মন্ত্রীবর্গ থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট রাজসভাসদগণ শূন্য মনে কিছুক্ষণ প্রাসাদ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থেকে যে যার মতো চলে গেলেন।

শুধু রানী ঔশীনরী অনেক সময় একভাবে প্রাসাদের শীর্ষ-অলিন্দে সহচরী পরিবৃতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের গোপনে এখন তাঁর একটিই প্রার্থনা—রাজর্ষি যেন নিরাপদে এবং শান্তিতে থাকেন।

হিমালয় পর্বতমালার মধ্যেই গন্ধমাদন পর্বত।

গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে রমণীয় পার্বত্য অধিত্যকা। যেখানে কোথাও চিরসবুজ বনভূমি, কোথাও পুষ্পিত বন-উপবন, কোথাও নির্ঝরিণী, কোথাও উপলমুখর স্রোতস্বিনী। মাঝে মাঝে বনভূমির মধ্যে স্বচ্ছ-সরোবর—যেখানে বনহংসের দল অহরহ জলক্রীড়ায় মত্ত হয়।

স্থানটি বিলাসবিহারের উপযুক্ত।

উর্বশীর ইচ্ছাতেই পুরূরবা এসেছেন এই রমণীয় অধিত্যকায়। এর আগে কখনো এই অঞ্চলে আসেননি তিনি।

রাজর্ষি মুগ্ধ হলেন রমণীয় পার্বত্য অধিত্যকার অনুপম সৌন্দর্য দেখে। প্রকৃতি এখানে অপরূপ সাজে সজ্জিতা।

পাহাড়ের পাদদেশে মনের মতো স্থান নির্বাচন করে আশ্রয়-নীড় রচনা করলেন পুরূরবা।

প্রকৃতি এখানে উর্বশী, পুরুষ পুরূরবা।

পুরুষ এখানে প্রকৃতির কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে। আর প্রকৃতিও পুরুষ সত্তার কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে।

প্রকৃতি আর পুরুষ এখানে একাকার।

উর্বশী পুরূরবার বিলাস বিহারের এখানে বিরতি নেই।

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর পুরূরবা—কিন্তু পুরূরবার সে পরিচয় এখানে নেই। এই প্রকৃতির রাজ্যে তিনি শুধু একজন প্রেমিক। প্রণয়িনীর জন্যে তিনি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এখানে এসেছেন। রাজ্যের কথা কোনো অসতর্ক মুহূর্তে মনেও পড়ে না তাঁর।

প্রকৃতি উর্বশীকে মনের মতো করে সাজাতে রাজর্ষির কত না আগ্রহ। উর্বশীর কোমলতনুতে সুগন্ধী চন্দন লেপন করেন নিজের হাতে, উর্বশীর চরণ যুগল নিপুণ শিল্পীর মতো অলক্তরাগে রঞ্জিত করেন, নিজের হাতে বেঁধে দেন কাঁচুলির বন্ধন—উর্বশীর কবরী অলঙ্কৃত করবার জন্যে আহরণ করে আনেন মনের মতো ফুল।

বনচারিণী হরিণ-হরিণীর মতো পুরূরবা আর উর্বশী রমণীয় উপত্যকায় দিনাতিপাত করছেন মনের আনন্দে।

এরই মধ্যে একদিন অপরাহ্ন কালে বনভূমি যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখর, মন্দাকিনীর তীরে যখন ময়ুর ময়ূরীরা নৃত্য রত—তখন রাজর্ষি উর্বশীকে নিয়ে বসেছিলেন শ্যামল দূর্বাদলের উপর। সামনেই কিছুটা দূরে মন্দাকিনীর প্রবহমান ধারা।

উর্বশীর এক সময় চোখ পড়লো দূরে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাটলে সুন্দর একটি ফুল ফুটে আছে।

সুন্দর পুষ্পটি চয়ন করতে ইচ্ছে হলো উর্বশীর। চঞ্চল পদক্ষেপে ছুটতে আরম্ভ করলো বনপথ ধরে। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল উর্বশী।

পুরূরবা একাকী কোমল দূর্বাদলের ওপর পদচারণা করছিলেন। মাঝে মাঝে দৃষ্টি তাঁর উর্বশীকেই সন্ধান করছিল।

একসময় পুরূরবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো একটি বিদ্যাধর কন্যার প্রতি। উদ্ভিন্ন যৌবনা বিদ্যাধর কন্যা উদয়বতী আপন মনে খেলা করছিল।

প্রকৃতির এই পরিবেশে মেয়েটিকে বড় সুন্দর লাগছে দেখতে। আপন মনে খেলা করছে মেয়েটি। বালি দিয়ে পাহাড় তৈরি করছে আর ভাঙছে। ভাঙা গড়ার খেলার আনন্দে মেতে আছে মেয়েটি।

পুরূরবার দেখতে ভালো লাগছে, তাই দেখছেন। দৃষ্টি তো সব সময় সুন্দরেরই সন্ধান করে।

এই নির্জনে মন্দাকিনীর তীরে একটি তরুণী আপন মনে খেলা করছে—এ দৃশ্য তো দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবেই।

পুরূরবা এই মুহূর্তে উর্বশীর কথা বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি বিদ্যাধর কন্যাটিকে দেখতে এমনই বিভোর হয়েছিলেন যে জানতে পারেননি কখন পুষ্প চয়ন করে উর্বশী এসে দাঁড়িয়েছে।

উর্বশী কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো উন্মনা পুরূরবাকে।

পুরূরবা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন বিদ্যাধর কন্যা সুন্দরী উদয়বতীকে।

উর্বশীর মনে হলো, স্বামীর মনে বোধহয় নতুন করে অনুরাগের সঞ্চার হচ্ছে ওই তন্বীকে দেখে। নয়তো স্বামীর চোখে পলক পড়ছে না কেন! তাছাড়া স্বামীর মুখের রেখাগুলি যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কাছে গেল উর্বশী। নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। ধিক্কার জানিয়ে বললে, ওই বিদ্যাধর কন্যা বুঝি তোমার চিত্তকে হরণ করেছে ?

পুরূরবা ভাবলেন উর্বশী পরিহাস করে একথা বলছে।

উর্বশী কণ্ঠস্বরে উত্তাপ মিশিয়ে বললে, এই তোমার প্রেম !

পুরূরবা এখনো ভাবছেন, উর্বশী তাঁর সঙ্গে নিছক রসিকতা করছে। বললেন, উর্বশী চেয়ে দেখো—মেয়েটি আপন মনে কেমন খেলা করছে। দেখেছো মেয়েটি কী সুন্দর।

—এখন আর উর্বশীতে বুঝি তোমার মন নেই ? উর্বশী বললে, ধিক তোমাকে—এই তোমার প্রেম !

—উর্বশী ! কী ছেলেমানুষী করছো !

কিন্তু উর্বশী এই মুহূর্তে এমনই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, রাজর্ষির কোনো কথাই তার মনে রেখাপাত করছে না।

পুরূরবা কত করে বোঝাতে চাইলেন, ওই বিদ্যাধর কন্যাটিকে তিনি নিছক চোখের দেখা দেখছিলেন, এ দেখার মধ্যে কোনো দুর্বলতা ছিল না। সুন্দরকে সব সময়ে তো দেখতে ইচ্ছে করে, তা সে একটি ফুল হোক, আর প্রজাপতি হোক—ফুলের মতো ওই বিদ্যাধর কন্যাটিকে দেখার মধ্যে কোনো কু-ভাব ছিল না।

পুরূরবার কোনো কথাও উর্বশী মেনে নিতে পারলো না। 'আমি চললাম যেদিকে দু চোখ যায়' বলে ছুটতে আরম্ভ করলো।

পুরূরবা তাকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু অভিমানিনী উর্বশী চঞ্চলা বন-হরিণীর মতো ছুটে চলছে, পুরূরবা তাকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না।

রাজা পুরূরবা ছুটছেন আর বারবার উর্বশীর নাম ধরে ডাকছেন—শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, উর্বশী সাড়া দিচ্ছে না।

গন্ধমাদন অধিত্যকা পার হয়ে উর্বশী ছুটছে। সামনেই দেব সেনাপতি চিরকুমার কার্তিকেয়-র সংরক্ষিত বনভূমি—কুমারবন। যেখানে কোনো রমণীর প্রবেশের অধিকার নেই। এবং কুমার বনে যদি কোনো রমণী প্রবেশ করে, তা সে স্বর্গবাসিনী হোক, আর মর্তবাসিনী হোক—সে বৃক্ষ কিংবা লতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে স্বর্গবাসিনীরা কুমারবনের কথা জানে, তারা

এ বনে প্রবেশ করে না।

আচার্য ভরতের অভিশাপে উর্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হয়ে মর্তলোকে এসেছে। এখন সে মানবী ছাড়া আর কিছু নয়। দেবলোকের কোনো অলৌকিকত্ব এখন তার মধ্যে নেই। তা যদি থাকতো তাহলে কুমার বনে প্রবেশ করে সে নিজের এই সর্বনাশ ডেকে আনতো না।

অভিমানিনী উর্বশী কুমারবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তির নির্মম বিধানে বনলতায় রূপান্তরিত হলো।

পুরূরবা দূর থেকে লক্ষ্য করলেন, হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল উর্বশী। অথচ পূর্ব মুহূর্তেই তিনি দেখেছেন উর্বশী উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে।

পুরূরবা কুমারবনে প্রবেশ করলেন। ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই বনভূমির কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। কিংবা এমনও হতে পারে, মায়াবিদ্যায় পারদর্শিনী স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশী মায়াবিদ্যাবলে নিজেকে গোপন রেখেছে। তিনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না প্রাণপ্রতিমা উর্বশীকে, কিন্তু উর্বশী হয়তো কাছেই আছে। যে কোনো মুহূর্তে হয়তো দেখা দিয়ে বলবে, এই তো আমি।

পুরূরবা জানেন না আচার্য ভরতের অভিশাপের কথা, জানেন না উর্বশী এখন আর অলৌকিক বিদ্যার অধিকারিণী নয়। উর্বশী তাঁকে কোনো কথাই বলেনি ভরতের অভিশাপ এবং ইন্দ্রের আশীর্বাদ প্রসঙ্গে।

বেশ কিছুসময় দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন পুরূরবা, কিন্তু উর্বশীকে দেখতে পেলেন না। বার বার তার নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু সাড়া পেলেন না। তবু এখনো তাঁর বিশ্বাস, উর্বশী নিবিড় বনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। ভাবছেন, প্রেমাভিমানিনী সে—হয়তো প্রেমিকের মনে নতুন করে বিরহ-রস সৃষ্টি করে নব পর্যায়ে মিলন কামনা করছে।

আরো কিছুক্ষণ গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বনপ্রান্তে অপেক্ষা করলেন রাজর্ষি। কিন্তু উর্বশী দেখা দিল না।

পুরূরবা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছেন। উৎকণ্ঠাও বাড়ছে। গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে এবারে আকুলকণ্ঠে উর্বশীর নাম ধরে ডাকছেন আর বলছেন, প্রিয় উর্বশী, অভিমান করে আমায় নতুন করে ব্যথা দিয়ো না—

তুমি এবারে নৃত্যের ঝংকার তুলে আমার কাছে এগিয়ে এসো।

কিন্তু বৃথা এ অরণ্যে রোদন। উর্বশী দেখা দিল না।

উর্বশী যদিও স্বর্ণলতায় রূপান্তরিত, কিন্তু এখনো তার ইন্দ্রিয়সমূহ সক্রিয়। সে শুনতে পাচ্ছে রাজর্ষির কণ্ঠস্বর, এখনো সে দেখতে পাচ্ছে তার হৃদয়দেবতাকে—কিন্তু সাড়া দেবার শক্তি তার নেই।

স্বর্ণলতিকারূপিণী উর্বশী থরথর করে কাঁপছে। সে জানে না, কোন অপরাধে তার এই পরিণতি। ভাবছে, এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল।

পুরূরবা এবারে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে অরণ্যের আরো গভীরে প্রবেশ করলেন।

সূর্যদেব এখন অস্তাচলগামী। দূরে কৈলাস শিখরে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলো প্রতিফলিত। কুমারবনের বৃক্ষ শীর্ষে এখন রঙের আলপনা। বনের বিহগকুল ক্লান্ত ডানায় আকাশ সন্তরণ করে বৃক্ষ শাখায় আপন আপন নীড়ে প্রত্যাবর্তন করছে, ময়ূর-ময়ূরী বৃক্ষ শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। মধুপেরা পুষ্পিত বন-উপবন থেকে মধু আহরণ শেষ করে আপন আশ্রয়চক্রে ফিরছে।

পুরূরবা আর হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে পারছেন না। বারবার তাঁর দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসছে। 'প্রিয়তমা উর্বশী, তুমি কোথায়!' এই বলে চিৎকার করতে করতে গভীর বনে বিচরণ করছেন। কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে অঙ্গ, উপলখণ্ডে আহত হচ্ছে পদদ্বয়, তবু তাঁর চলার বিরাম নেই। ভাবছেন, কী অশুভ ক্ষণেই না তিনি বিদ্যাধর কন্যাকে দেখেছিলেন। উর্বশী কেন তাঁর মনের কথা বুঝলো না—সে তো অবুঝ নয়। না কি স্বর্গলোকে নন্দনবনে ফিরে যাবার জন্যে এমন কোনো অছিলার অপেক্ষায় ছিল! না—উর্বশীর প্রেম মিথ্যা ছিল না। সে তো স্ব-ইচ্ছায় নন্দনের মোহ ত্যাগ করে মর্তধামে এসেছে।

কুমারবনে সন্ধ্যা নামলো।

চাঁদ উঠলো আকাশে। পূর্ণ চাঁদ নয়—ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না ঝরে পড়লো বনভূমিতে। শিশির-সিক্ত পত্র পল্লবে জ্যোৎস্নার স্পর্শ—মনে হয় মুক্তাবিন্দুর অলংকার পরেছে জ্যোৎস্না-পুলকিত বনভূমি।

পুরূরবা এখন ক্লান্ত। পা আর চলছে না। তবুও চলছেন। চলতে চলতে একসময় অবসন্ন শরীরকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে কোমল দূর্বাদলের ওপর শুয়ে পড়লেন হাত দুটি মাথার নিচে দিয়ে।

কোমল দূর্বার স্পর্শ নয়—পুরূরবা অনুভব করছেন উর্বশীর কোমলতনুর স্পর্শ সুখ। গভীর আবেশে দু-চোখ বন্ধ হয়ে এলো তাঁর। নিদ্রা নয়, তাঁর তন্দ্রাতুর মনে এখন সুখ স্বপ্নের স্বাদ।

তন্দ্রাঘোর ভেঙে গেল ময়ূরের কেকাধ্বনিতে। তড়িতাহতের মতো উঠে বসলেন পুরূরবা। দেখলেন, পুষ্পিতবনের ধারে ময়ূর-ময়ূরীর দল শৃঙ্গার নৃত্যে মত্ত।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পুরূরবার বুকের গভীর থেকে। উর্বশী-চিন্তা তাঁর দেহমনকে আরো বিবশ করে তুলছে।

রাত শেষ হলো। সূর্য উঠলো। পুরূরবা সূর্যদেবকে প্রণাম করে চারদিকের পটভূমিকায় দৃষ্টিপাত করলেন। হৃদয় তাঁর নতুন করে বেদনা-মথিত হলো উর্বশীর কথা চিন্তা করে। স্বর্গের অপ্সরা সে, না জানি এই নির্জন বনের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাত্রি যাপন করতে কত কষ্ট হয়েছে তার। তাছাড়া সে তো কখনো একা থাকেনি। কোথায় ইন্দ্রের প্রমোদ নিকেতনের সুসজ্জিত কক্ষ, আর কোথায় এই নির্জন অরণ্য।

পুরূরবা আর চিন্তা করতে পারছেন না। আবার তিনি উর্বশী-সন্ধানে বন পরিক্রমা আরম্ভ করলেন।

উর্বশীর চিন্তায় পুরূরবা এখন উন্মাদের মতো হয়ে গেছেন। 'কোথায় আমার প্রিয়া উর্বশী'—এই একটি জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি বনদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত উর্বশীকে অন্বেষণ করছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন।

বৃক্ষ-শাখায় কোনো পাখি বসে আছে, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন, ওগো বন্ধু পাখি, তুমি তো বনের অনেক খবর জানো, তুমি কি দেখছো আমার প্রিয়াকে. তুমি কি জানো সে কোন পথে গেছে?

কোনো ফুল ফুটে আছে, সেই ফুলের কাছেও তাঁর একই জিজ্ঞাসা।

আবার কোনো লতার অঙ্গ স্পর্শ করে বলছেন, তুমি কি দেখেছো উর্বশীকে ?

আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে—পুরূরবা দেখছেন, মেঘ নয় যেন ভয়ংকর কোনো দৈত্য—যে তাঁর উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতের দ্যুতি দেখে পুরূরবা ভাবছেন, ওই বোধহয় ক্ষণপ্রভারূপিণী উর্বশী।

কিন্তু যে মুহূর্তে ধারাবর্ষণ শুরু হলো সেই মুহূর্তে তাঁর ভুল ভাঙলো। নিজেই তখন নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমার কি চিত্ত বিভ্রম ঘটছে ?

ধারাবর্ষণে স্নাত হলেন পুরূরবা। শীতল হলো তাপদগ্ধ শরীর। কিন্তু বিরহ-তাপদগ্ধ মনকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই, উর্বশীই যেখানে একমাত্র সান্ত্বনা।

পুরূরবা এগিয়ে চলেছেন। বনভূমির মৃত্তিকা এখন ধারাবর্ষণে সিক্ত। বালুকামিশ্রিত সিক্ত মৃত্তিকায় পদচিহ্ন অন্বেষণ করছেন পুরূরবা। উর্বশী যদি এখন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে এই পথে গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই গুরুনিতম্ববতী উর্বশীর পায়ের ছাপ দেখা যেত। কিন্তু কোথাও সেই সুন্দরীর পদচিহ্ন দেখতে পেলেন না।

কিছুটা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন পুরূরবা। শ্যামল দূর্বার ওপর স্তনাবরণ বস্ত্র পড়ে আছে। নিশ্চয়ই ক্রোধভরে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলার সময় বক্ষদেশ থেকে স্খলিত হয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন, উর্বশীর স্তনাবরণ বস্ত্র নয়, পরিণত শ্যামল দূর্বার মধ্যে কিছুটা জায়গায় সদ্য-উদ্‌গত কচি দূর্বা, যে গুলির বর্ণ এখনো ঈষৎ স্বর্ণাভ। ওই স্বর্ণাভ দূর্বাদল গুচ্ছ দেখে রাজর্ষির দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল।

স্বর্ণাভ দূর্বাদল স্পর্শ করে আবার এগিয়ে চললেন পুরূরবা। চলতে অশক্ত, তবু চলেছেন। এবারে শুনতে পেলেন কেকাধ্বনি। আকাশমুখী হয়ে একটি ময়ূর আনন্দে কেকাধ্বনি করছে। ময়ূরের কাছে গেলেন পুরূরবা, আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সুহৃদ—তুমি কি দেখেছো তাকে ?

কী উত্তর দেবে ময়ূর। কণ্ঠদেশ উন্নত করে শুধু একবার রাজর্ষির দিকে তাকালো।

একটি বৃক্ষ শাখায় কোকিল বধূকে দেখতে পেলেন পুরূরবা—তার কাছেও

রাজর্ষির সেই একই জিজ্ঞাসা। কোকিল বধূ শুধু তার ভাষায় একবার ডেকে উঠে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

এবারে মন্দাকিনীর তীরে এসে পৌঁছলেন রাজর্ষি। দৃষ্টিপাত করলেন চারদিকের পটভূমিকায়। তারপর আঁজলা ভরে মন্দাকিনীর অমৃত-বারি পান করে প্রশস্ত উপলখণ্ডের ওপর বসলেন। শ্রান্ত দেহ, অবসন্ন মন—বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ মনে হলো নূপুরশিঞ্জিত পদক্ষেপে কে যেন এগিয়ে আসছে।

দেখলেন, মানস গমনে উৎসুক একদল রাজহংস মন্দাকিনীর তীরে ছোট ছোট নুড়ি পাথরের ওপর চলাফেরা করছে।

পুরূরবা বললেন, আমার প্রিয় হংসদূতগণ, তোমরা তো কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে ডানা মেলবে, তোমরা তো দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মানসসরোবরে যাবে—তোমাদের বলছি, যদি তোমরা আমার প্রিয়াকে দেখতে পাও, তবে তার সংবাদ আমাকে একবার কষ্ট করে জানিয়ে যেয়ো।

রাজহংসের দল ডানা মেললো আকাশে। হংসবলাকার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন ভগ্নহৃদয় পুরূরবা।

রাজহংসরা দূর-আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে মন্দাকিনীর তীরভূমি ধরে চলতে আরম্ভ করলেন পুরূরবা। কুমারবনের এই অঞ্চল পরম রমণীয়। চারদিকে পুষ্পভারে নত লতা, গুল্ম এবং বৃক্ষসমূহ। বাতাস এখানে পুষ্পগন্ধ মাখা।

চলতে চলতে পিঙ্গল বর্ণের একটি চক্রবাককে দেখতে পেলেন রাজর্ষি। চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করলেন, বন্ধু চক্রবাক তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখেছো?

চক্রবাক তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

পুরূরবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হলো চক্রবাক যেন বিদ্রুপ করে বলছে, তুমি কে হে?

পুরূরবা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে চেনো না! আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সূর্যদেব আমার মাতামহ, চন্দ্রদেব পিতামহ—আমি রাজর্ষি পুরূরবা। আরো শোনো, যার নৃত্যের ছন্দে ধ্যানমগ্ন তাপসের ধ্যান

ভেঙে যায়, যার রূপসুধা পান করার জন্যে স্বর্গের দেবকুল সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকেন, স্বয়ং দেবরাজ যার নিত্য সান্নিধ্য কামনা করেন, স্বয়ং নারায়ণ যাঁকে সৃষ্টি করেছেন, রূপগর্বিতা লক্ষ্মীর সৌন্দর্য যার কাছে ম্লান—সেই সুরলোক সুন্দরী উর্বশী আমার প্রিয়া, আমাকে বিদ্রুপ করা তোমার সাজে না।

চক্রবাক আরো একবার কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠে আকাশে ডানা মেললো। পুরূরবা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ভাবলেন, এত সময় কাকে কি বলছিলেন তিনি। পাখি কি করে বুঝবে তাঁর ভাষা।

কিন্তু উর্বশীর চিন্তা সত্যিই তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছে। স্বাভাবিক বোধশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে এলেও, পর মুহূর্তে উর্বশী চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে তুলছে।

এবারে একটি সরোবরের তীরে এলেন পুরূরবা। দেখলেন, অজস্র পদ্ম ফুটে আছে সরোবরে। যে পদ্মবনে প্রিয়া বিরহে অধীর হয়ে কামার্ত তরুণ একটি রাজহংস তার দীর্ঘচঞ্চু দিয়ে পদ্মদলকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

সরোবরের তীরে এসে দাঁড়ালেন পুরূরবা। যেখানে জলের কিনারে একটি পদ্মের মধ্যে মধুকর বন্দী হয়ে গুঞ্জন করছে। এই গুঞ্জনের ধ্বনি এমনই —রাজর্ষি যখন রমণ ক্রীড়ার সময়ে উর্বশীর অধরসুধা পান করতেন, তখন প্রিয়ার মুখ থেকে এমনই শীৎকার ধ্বনি শোনা যেত।

পুরূরবার হৃদয়ে রতিরসের সঞ্চার হলো। কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। বন্দী মধুকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মধুকর তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখেছো? আমার প্রিয়ার নাম উর্বশী, যার অঙ্গগন্ধ ভ্রমর-উচ্ছিষ্ট নয় এমন পদ্মগন্ধের চেয়েও মধুর।

সরোবরের তীরে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে উদভ্রান্ত পুরূরবা আবার চলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোথায় উর্বশী!

কুমারবন অতিক্রম করে পুরূরবা এসে পৌছলেন স্ফটিক পর্বতের সানুদেশে। পুরূরবা শুনেছেন এই রম্য উপত্যকা, এই পর্বত, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণের প্রিয়। মাঝে মাঝে তারা দল বেঁধে এই সব অঞ্চলে বিহার করতে আসে।

এই পর্বতে অজস্র গুহা রয়েছে, যে গুহার অভ্যন্তরে অপ্সরাগণ চিত্তবিনোদনের জন্যে আসে। এবং এই গুহাগুলির বাতাসে সব সময় সুগন্ধ

জড়িয়ে থাকে।

প্রতিটি গুহা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন পুরূরবা—কিন্তু কোনো অপ্সরারই দেখা পেলেন না। উর্বশী তো দূরের কথা।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পুরূরবা ফিরে এলেন উপত্যকায়। এখন তিনি রীতি-মতো হতাশ, তাঁর মন বলছে উর্বশী আর ফিরবে না।

অবশেষে উপত্যকার প্রান্তদেশে এলেন রাজর্ষি—যেখানে সুন্দর একটি পার্বত্য স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে। এই স্রোতস্বিনীর উচ্ছল জলধারা মন্দাকিনীতে মিলিত হয়েছে।

অজস্র উপলখণ্ডের বাধা অতিক্রম করে পার্বত্য স্রোতস্বিনী ছুটে চলেছে। স্রোতস্বিনীর কলোচ্ছ্বাস মনে করিয়ে দিচ্ছে উর্বশীর চরণের নূপুর ধ্বনিকে। শুধু তাই নয়, উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে জলে যে ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে, এবং যে ফেনপুঞ্জ এক জায়গায় কিছুক্ষণ আবর্তিত হয়ে মূল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—দেখে পুরূরবার মনে হচ্ছে যেন প্রিয়ার নিতম্ব থেকে বস্ত্র স্খলিত হচ্ছে।

পরূরবার এমনই চিত্তবিভ্রম ঘটেছে যে, পার্বত্য স্রোতস্বিনী এখন তাঁর চোখে অভিমানিনী উর্বশী রূপে প্রতিভাত। তাই তো স্রোতস্বিনীকে 'প্রিয়া উর্শী' সম্বোধন করে বললেন, প্রিয়া তুমি অভিমান ত্যাগ করো।

পরমুহূর্তে পুরূরবার বিভ্রান্তির অবসান ঘটলো। ক্ষণকাল অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থেকে কিছু চিন্তা করে আপনমনে হাসলেন। করুণ সে হাসি। এবারে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বসলেন একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর। সামনে উর্বশী নয়, পার্বত্য স্রোতস্বিনী—অভিসারিকার মতো যে চলেছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

ক্ষণ বিশ্রামের পর পুরূরবা আবার উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকের নয়না-ভিরাম দৃশ্যপটে দৃষ্টি সম্পাত করে আবার মন্থর পদক্ষেপে চলতে আরম্ভ করলেন।

কিছু পথ অতিক্রম করে একটি লোহিত কদম্বতরুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। উর্বশীর মুখেই শুনেছেন, লোহিত কদম্ব পুষ্প তার খুবই প্রিয়। গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষে সে সযত্ন রচিত কবরী অলংকৃত করতো লোহিত কদম্ব পুষ্প দিয়ে।

লোহিত কদম্ব তরুর নিচে দাঁড়ালেন পুরূরবা। কদম্ব তরুর নিবিড় ছায়া এখন সান্ত্বনা-স্পর্শের মতো। বেশ লাগছে তাঁর।

হঠাৎ পুরূরবা দেখতে পেলেন সামনেই একটা পাথরের ফাটলের মধ্যে রক্তবর্ণের একটা কিছু রয়েছে। ভাবলেন, হয়তো কোনো সিংহ জন্তু জানোয়ার শিকার করে এখানে মাংস ভক্ষণ করেছে—রক্তাক্ত মাংসের টুকরো আটকে রয়েছে পাথরের ফাটলে।

কিন্তু মাংসখণ্ড হলে অমন জ্বলজ্বল করবে কেন?

তবে কি কোনো প্রাকৃতিক কারণে ওই পাথরের ফাটলের মধ্যে থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর ওই অগ্নি হয়তো দাবানল সৃষ্টি করবে।

পাথরের কাছে এগিয়ে গেলেন পুরূরবা। ভুল ভাঙলো, মাংসখণ্ড কিংবা বিচ্ছুরিত অগ্নিবিন্দু নয়—পাথরের ফাটলের মধ্যে একটি রক্তাভ মণি। যে মণি থেকে এমন আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে।

একটু ভাবলেন, মণিটিকে স্পর্শ করবেন কি না।

তারপর মণিটিকে সন্তর্পনে তুলে নিলেন পুরূরবা।

মণিটির অপূর্ব দ্যুতি দেখে মুগ্ধ হলেন রাজর্ষি। মুহূর্তের জন্যে তাঁর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হলো, কিন্তু উর্বশীর কথা মনে আসার সঙ্গে তাঁর নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো, হৃদয় মথিত হলো অপরিসীম বেদনায়। ভাবছেন, আজ জীবন সার্থক হতো, যদি এই দুর্লভ মণিটি দিয়ে প্রিয়ার সীমন্তসরণি অলংকৃত করতে পারতেন।

উর্বশী যখন নেই তখন কী প্রয়োজন এই মণিতে—এই চিন্তা করে যে মুহূর্তে মণিটি পার্বত্য স্রোতস্বিনীতে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন পুরূরবা, সেই মুহূর্তে অলক্ষ্য থেকে মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'বৎস মণিটিকে তুচ্ছ মনে করে ফেলে দিয়ো না। মনে রেখো, ওই মণির নাম সঙ্গমমণি। শোনো ওই মণির রহস্য, হিমালয়নন্দিনী পার্বতীর চরণ পদ্মের অলক্ত থেকে এই মণির সৃষ্টি। এই মণি যে ধারণ করে তার বিরহজনিত ব্যথা থাকে না, প্রিয়জনের সঙ্গে তার স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে মিলন সংঘটিত হয়।

পুরূরবা বিস্মিত হলেন। কার কণ্ঠস্বর! কে এমন আশার বাণী শোনালেন।

আকাশের দিকে তাকালেন পুরূরবা, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন জ্যোতির্ময় মূর্তিতে স্বয়ং চন্দ্রদেব।

পলকের জন্যে দেখা দিয়ে চন্দ্রদেব আবার শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

পুরূরবা এবারে করপুটে রাখা মণিটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন, সত্যিই যদি তাঁর বিরহজনিত ব্যথা দূর হয়, যদি উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন, তাহলে এই মণিটিকে আপন শিরোভূষণ করে রাখবেন—দেবাদিদেব যেমন চন্দ্রকে মাথায় করে রেখেছেন।

পুরূরবার হৃদয় এখন শান্ত, বিরহের সে জ্বালা আর নেই। যদিও হৃদয় তাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্ত হচ্ছে না, যত সময় না প্রিয়া উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তাঁর মনে এখন একটাই চিন্তা, কোন পথে গেলে প্রিয়ার দেখা পাবেন।

যে পথ ধরে এসেছিলেন আবার সেই পথেই ফিরে চললেন তিনি।

দিন শেষ হয়ে গেছে, আকাশে এখন শুক্লপক্ষের চাঁদ। রমণীয় পার্বত্য ভূমি, বন-উপবন এখন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত।

চারদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্যপট অবলোকন করতে করতে রাজর্ষি পুরূরবা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন।

আবার কুমারবনে প্রবেশ করলেন পুরূরবা। তাঁর মন বলছে, এই বনের কোথাও না কোথাও উর্বশী আত্মগোপন করে আছে।

গন্ধমাদন অতিক্রম করে যেখানে প্রথম কুমারবনে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে এসে চারদিক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর উচ্চকণ্ঠে উর্বশীর নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন।

শুধু আপন কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। উর্বশী সাড়া দিলে না।

এবারে করপুটে রক্ষিত মণিটিকে দেখলেন পুরূরবা—চন্দ্রাবলী স্পর্শে মণিটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়লো পুরূরবার—একটি স্বর্ণলতা থরথর করে কাঁপছে।

এতটুকু বাতাস নেই, তবে লতাটি অমন কাঁপছে কেন! আর লতাটি দেখেই বা তাঁর চিত্তে এমন দোলা লাগলো কেন!

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন লতাটির কাছে। অতি সাধারণ লতা—কিন্তু লতাটিকে যত দেখছেন, তত বিস্ময়ের সঞ্চার হচ্ছে তাঁর মনে। ভাবছেন, লতাটিকে স্পর্শ করবেন কি করবেন না—এরই মধ্যে কখন যেন স্পর্শ করে ফেললেন লতাটিকে। লতাটিকে স্পর্শের মুহূর্তে পুরূরবার দু চোখ বন্ধ হয়ে এলো এক সুখ-কল্পনায়। মনে হচ্ছে, কোনো বনলতা নয়, উর্বশীর অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করছেন। তাঁর অন্তরে ঠিক এমনই সুখানুভূতি জেগেছিল, যেদিন তিনি প্রথম উর্বশীর অঙ্গ-স্পর্শ লাভ করেন।

কেমন যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে পড়লেন পুরূরবা, মৃত্তিকায় উপবেশন করে লতাটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু দু-চোখ তাঁর বন্ধ—চোখ মেলে চাইতে পারছেন না, পাছে এই সুখ-স্বপ্ন ভেঙে যায়। ভাবছেন, এই তো ভালো, এই তো প্রিয়ার স্পর্শ-সুখ!

উর্বশী তখন রূপ পরিগ্রহ করেছে। রাজর্ষির বাহুবন্ধনে তখন বনলতা নয়—উর্বশী। কিন্তু রাজর্ষি তখনো ভাবছেন, এ এক সুখ স্বপ্ন।

—রাজর্ষি! স্বামী!

উর্বশীর কণ্ঠস্বর।

পুরূরবার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, লুটিয়ে পড়েন উর্বশীর কোলের ওপর।

—রাজর্ষি! রাজর্ষি!

উর্বশীর কণ্ঠে আকুলতা।

তবু পুরূরবার চেতনা ফিরছে না।

এবারে উর্বশী চিন্তিত হয়ে পড়ে রাজর্ষিকে দেখে। কী চেহারা হয়েছে রাজর্ষির! পরনের রাজবেশ ছিন্ন হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গ কাঁটার আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত, পদযুগল কর্দমাক্ত--মাথার চুলে এক রাশ শুকনো লতাপাতা জড়িয়ে, আর শরীর যেন কালিমালিপ্ত।

উর্বশী কান্নায় ভেঙে পড়লো।

উর্বশীর ক্রন্দন মন্ত্রের মতো কাজ করলো। পুরূরবা চোখ মেললেন। চোখের সামনে উর্বশীকে দেখেই আবার দু চোখ বন্ধ করলেন।

—রাজর্ষি। এই দেখ, আমি।

—উর্বশী! সত্যি তুমি!

—চেয়ে দেখ।

—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।

—স্বপ্ন নয় স্বামী, আমি তোমার অভিমানিনী উর্বশী।

পুরূরবার দৃষ্টি মিলিত হলো উর্বশীর দৃষ্টিতে।

উর্বশী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আমায় ক্ষমা করো রাজর্ষি। আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। তোমার ওপর আর কখনো অভিমান করবো না. ক্রোধান্বিত হয়ে আর কখনো নিজেকে এত কষ্ট দেবো না।

উর্বশীর দু চোখে এখন জল টলমল করছে।

পুরূরবা বললেন, চোখের জল মুছে ফেল উর্বশী। আমার আর কোনো দুঃখ কোনো যন্ত্রণা নেই। কিন্তু একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

—বলো কি জানতে চাও?

—তোমার এত রূপ, এত লাবণ্য, কিন্তু তোমার হৃদয় কি পাষাণ দিয়ে গড়া?

উর্বশী নিরুত্তর।

পুরূরবা বলতে লাগলেন, জানো আমি কি ভাবে এই বনদেশে তোমার সন্ধান করেছি। বন থেকে বনান্তরে গিয়েছি, গিয়েছি স্ফটিক পর্বতেও। উন্মাদের মতো আমি বনের পশুপক্ষী, তরুলতাকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কথা। চিৎকার করে ডেকেছি তোমার নাম ধরে। আমার কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই শুধু শুনেছি, কিন্তু তোমার সাড়া পাইনি।

—রাজর্ষি, সবই আমি জানি।

—সে কি!

—হ্যাঁ।

—তবে আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে কেন?

উর্বশী আনুপূর্বিক ঘটনার কথা বলে গেল। আচার্য ভরতের অভিশাপে সে স্বর্গভ্রষ্টা। যদিও আচার্যের সে অভিশাপ উর্বশীর কাছে ছিল পরম আশীর্বাদ। কিন্তু যখনই সে মর্তলোকে এসেছে, তখন সে সাধারণ মানবী। স্বর্গের কোনো অলৌকিকত্ব তার মধ্যে ছিল না। তাই তো সে বিস্মৃত হয়েছিল এই কুমারবনের কথা। কুমারবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে লতায়

রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তখনো তার অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তর্চেতনা লুপ্ত হয়নি।

এত কথা বললে উর্বশী, কিন্তু ইন্দ্রের সেই ভয়ংকর আশীর্বাদের কথা প্রকাশ করলো না।

রাজর্ষি পুরূরবা এতক্ষণে স্বস্তি অনুভব করলেন।

উর্বশী বললে, কুমারবনের কথা জানতে পারতাম না, যদি না চিত্রলেখা এখানে আসতো। তুমি আসার আগেই সে এসেছিল। ওরা স্বর্গ থেকেই জানতে পেরেছিল আমার এই অবস্থার কথা।

পুরূরবা এবারে সঙ্গমমণিটি উর্বশীকে দেখিয়ে বললেন, এই মণিটির জন্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি উর্বশী।

উর্বশী মুগ্ধ হলো মণির উজ্জ্বলতা দেখে। বললেন, কোথায় পেলে এই সুন্দর মণিটি?

সঙ্গমমণিটি কি ভাবে পেয়েছেন ব্যক্ত করলেন পুরূরবা। চন্দ্রদেবের কথাও প্রকাশ করলেন। তারপর মণিটি উর্বশীর সীমন্তিনীতে সংস্থাপন করে বললেন, এখন থেকে এ মণি তোমার সীমন্তিনীতেই শোভা পাবে প্রিয়া।

উর্বশীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে।

আর পুরূরবা নতুন চোখে দেখছেন উর্বশীকে। সঙ্গম মণির রক্তাভ দ্যুতিতে উর্বশীর মুখ এখন রক্তরাগে উদ্ভাসিত। মনে হয় যেন শ্বেত পদ্ম রক্ত পদ্মে রূপান্তরিত।

—চলো উর্বশী, আর এখানে নয়। পুরূরবা বললেন, ভুলে যেয়ো না আমরা এখনো কুমারবনেই আছি।

—সত্যি, উর্বশী বললে, আমিও বিস্মৃত হয়েছিলাম।

উর্বশীকে নিয়ে পুরূরবা আবার গন্ধমাদনে ফিরে এলেন।

উর্বশী বললে, রাজর্ষি আর এই বনবাসে প্রমোদ ভ্রমণ নয়, চলো আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই। আরো একটি নিবেদন, আমার ইচ্ছা সঙ্গমমণিটি আপনার রাজমুকুটের শোভা বর্ধন করুক।

পুরূরবা কিছুটা বিস্মিত হলেন উর্বশীর কথায়।

উর্বশী বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো—আপন আপন হৃদয়-বিলাস চরিতার্থ করতে আমরা এই বনদেশে এসেছি, হয়তো তারই জন্যে এই শাস্তি

ভোগ। রাজ্যের প্রজাকুল হয়তো রাজর্ষির ওপর এতদিনে বিরূপ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রাসাদে রয়েছেন দেবী ঔশীনরী—তাঁর মনের অবস্থার কথা কি চিন্তা করে দেখেছো? হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর। চলো, আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই।

—উর্বশী, তুমি কি একথা মন থেকে বলছো?

—হ্যাঁ রাজর্ষি।

—বেশ, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রিয়া। পুরূরবা বললেন, কিন্তু আমার রথ তো আমাদের পৌছে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেছে—যাবে কি করে?

—কেন এখান থেকে আমরা পদব্রজে কোনো লোকালয়ে গমন করবো। তারপর সেখানে কি কোনো যানবাহন মিলবে না? ভুলে যাচ্ছো কেন, তুমি রাজা।

পুরূরবা কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তুমি তো অপ্সরা—মায়াবিদ্যার পারদর্শিনী, তুমি তো এমন একটি আকাশযান তৈরি করতে পারো, যা আমাদের উর্ধ্ব আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাজধানীতে।

উর্বশী হাসলো।

—হাসছো কেন উর্বশী?

—এখন আমি আর স্বর্গ অপ্সরা নই স্বামী। সাধারণ মানবী মাত্র। স্বর্গের অলৌকিকত্ব এখন আর আমার মধ্যে নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে কুমারবনে ওই যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হতো না। তবু আমার কি মনে হয় জানো, স্বর্গের অনন্ত সুখ আমি চাই না। আমি চাই আরো দুঃখ, আরো সুখ। বিরহ যন্ত্রণারও যে একটা মধুর স্বাদ আছে তা আগে বুঝতাম না। স্বর্গ শুধু আত্ম-সুখের জন্যে—আমি স্বর্গের কথা বিস্মৃত হতে চাই রাজর্ষি। চলো, আমরা পদব্রজেই যাত্রা আরম্ভ করি। তবে রাজর্ষির যদি আজ বিশ্রাম গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করতে পারেন।

পুরূরবা বললেন, না উর্বশী—এখন আমার কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। তবু আমার ইচ্ছা—

—কি ইচ্ছা স্বামী ?

—তুমি তোমার প্রিয়সখি চিত্রলেখাকে স্মরণ করে দেখ না, যদি সে একটি সুন্দর আকাশযান আমাদের জন্যে পাঠাতে পারে। তোমার হৃদয় চিন্তা নিশ্চয়ই তার হৃদয়কে স্পর্শ করবে।

—রাজর্ষির বুদ্ধির প্রশংসা করি।

উর্বশী কিছুটা নির্জনে গিয়ে একটি শিলাখণ্ডের ওপর উপবেশন করে হৃদয় দিয়ে সখি চিত্রলেখাকে স্মরণ করলো।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। রামধনু শোভিত মেঘের রথ নেমে এলো আকাশ পথে। যে রথের শীর্ষদেশে বিদ্যুৎ বর্ণের পতাকা শোভা পাচ্ছে।

রাজর্ষি পুরূরবা উর্বশীকে নিয়ে সেই স্বয়ংক্রিয় অপূর্ব মেঘরথে আরোহণ করলেন। বিদ্যুৎ গতিতে রথ উর্ধ্ব আকাশের মেঘলোকের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললো রাজধানী প্রতিষ্ঠাননগরীর উদ্দেশে।

উৎসব-সাজে সজ্জিত হলো প্রতিষ্ঠাননগরী।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে রাজর্ষি পুরূরবা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন—এ সংবাদে রাজ্যবাসীগণও আনন্দিত। একজন অপ্সরার প্রেমে আত্মহারা হয়ে রাজর্ষি দিনাতিপাত করুন, এটা কোনো প্রজাই কামনা করে না।

শুধু তাই নয়, স্বয়ং উর্বশীই বলেছে পুরূরবাকে, রাজকার্যে মনঃসংযোগ করতে। লোকপ্রিয় রাজা রমনীর প্রেমে আত্মমগ্ন থাকুন, উর্বশীও তা কামনা করে না।

পুরূরবা আবার রাজকার্যে মন দিয়েছেন। প্রতিদিন সভাগৃহে বসছেনও। ঠিক যেমনটি আগে করতেন। মাঝে মাঝে রাজ্য পরিভ্রমণে যাচ্ছেনও।

রাজপ্রাসাদে আছেন পাটরানী দেবী ঔশীনরী আর উর্বশী। এতদিন দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, এখন আর তা নেই। এখন দুজনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন। দেবী ঔশীনরী স্নেহ করেন উর্বশীকে। সে স্নেহ অকৃত্রিম।

ঐশীনরীর জীবনে একটি দুঃখ—সন্তানের জননী হতে পারেননি। এ দুঃখ রাজর্ষির মনেও। এমনকি রাজ্যবাসীও চিন্তা করেন, রাজর্ষির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে!

দেবী ঐশীনরী একদিন সঙ্গোপনে উর্বশীকে আপন দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেন।

উর্বশীর হৃদয়-মন সিক্ত হলো দেবী ঐশীনরীর দুঃখের কথা শুনে। সে অপ্সরা, তবুও অনুভব করে মা না হওয়ার যন্ত্রণা কি।

উর্বশী কোনো সময়েই ভুলতে পারে না দেবরাজ ইন্দ্রের সেই ইচ্ছার কথা। আর ভুলতে পারেনি বলেই তো রাজর্ষিকে কোনোদিন মিলনের চরম আনন্দ দিতে পারেনি।

কিন্তু যেদিন গন্ধমাদন থেকে ফিরে আসে, সেদিন রথের মধ্যে সে কি আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিল! তবে কি দেবী ঐশীনরী তার মধ্যে গর্ভসঞ্চারের কোনো লক্ষণ দেখে আজ আপন দুঃখের কথা এ ভাবে প্রকাশ করলেন।

মনের মধ্যে একটা অপরিসীম যন্ত্রণা অনুভব করলো উর্বশী। দেবী ঐশীনরীকে প্রণাম করে সে মন্থর পদক্ষেপে কক্ষের বাইরে এলো। এখন তার নিশ্চিত বিশ্বাস দেবরাজ ইন্দ্রের বাসনা পূর্ণ হতে চলছে।

কিন্তু রাজর্ষিকে ত্যাগ করে আবার সেই স্বর্গলোকে ফিরে যেতে হবে, একথা ভাবতেই পারছে না সে।

সেদিন রাত্রে।

রাজসভাগৃহ থেকে পুরূরবা এলেন মণিহর্ম্যে উর্বশীর কক্ষে।

প্রতিদিন এই সময়ে উর্বশী রাজর্ষির অপেক্ষায় কক্ষের বাতায়নের কাছে বসে থাকে। কিন্তু বাতায়ন প্রান্তে তো নয়ই, কক্ষে প্রবেশ করেও উর্বশীকে দেখতে পেলেন না রাজর্ষি।

কোথায় গেল উর্বশী! এ সময়ে কোথাও তো সে যায় না।

মণিহর্ম্যের সর্বত্র সন্ধান করলেন রাজর্ষি। কিন্তু উর্বশী নেই। অন্তঃপুর পরিচারিকারাও কিছু বলতে পারলো না।

রাজর্ষি প্রমোদউদ্যানের দিকে অগ্রসর হলেন। নিশ্চয়ই সে প্রমোদ

উদ্যানের কোথাও আছে।

প্রমোদ উদ্যানের নির্জন কোণে কুসুমিত লতাবিতানের নিচে শ্বেত মর্মর নির্মিত আসন। নিভৃত মুহূর্ত যাপনের উপযুক্ত স্থান।

পুরূরবা দেখলেন, উর্বশী মর্মর-আসনে চুপচাপ বসে আছে।

লতাবিতানের রন্ধ্রপথে চাঁদের আলোর রেখা এসে পড়েছে উর্বশীর মুখে। দু চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার মুখচন্দ্রকে কেমন ম্লান মনে হচ্ছে। তাছাড়া তার কোমলতনুও কেমন যেন শীর্ণ মনে হচ্ছে।

কী হয়েছে উর্বশীর!

কাছে গেলেন পুরূরবা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলেন। উর্বশীর চোখ তখনো বন্ধ।

পুরূরবা ভাবছেন, তবে কি উর্বশী ঘুমিয়ে পড়েছে!

আরো ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে উর্বশীকে লক্ষ্য করলেন। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে উর্বশীর নাম ধরে ডাকলেন।

চোখ মেলে তাকালো উর্বশী। শুধু তাকালো এই পর্যন্ত, একটি কথাও উচ্চারণ করলো না।

পুরূরবা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কেন প্রিয়া!

উর্বশী বললে, স্বামী—আমার কি এখানে আসার অধিকার নেই। আমার কি একা থাকতে ইচ্ছে হয় না।

পুরূরবা বললেন, কই সে কথা তো আমি বলিনি। কিন্তু তোমাকে এখন এত ম্লান মনে হচ্ছে কেন? তোমার দৃষ্টি নিষ্প্রভ, তোমার কেশগুচ্ছ কবরী বন্ধনে বিন্যস্ত করোনি, চরণদ্বয়ও অলক্তরঞ্জিত করোনি, তাছাড়া প্রসাধনের কোনো চিহ্নই তোমার অঙ্গে নেই—কী হয়েছে তোমার! আবার কিসের অভিমান!

—অভিমান নয় রাজর্ষি।

—তবে।

—কিছুই নয়।

পুরূরবা লক্ষ্য করলেন উর্বশীর দু-চোখ জলে ভরে উঠছে। সে জল, বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে তার স্তনাবরণ-বস্ত্রের ওপর।

উর্বশী যাই বলুক, মনে মনে বিচলিত বোধ করলেন রাজর্ষি। বললেন, তোমার চোখে জল কেন প্রিয়া? কেউ কি তোমাকে আহত করেছে কোনো কথায়?

—না রাজর্ষি। উর্বশী আঁচলে চোখের জল মুছে বললে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।

—দুঃস্বপ্ন। কি সে দুঃস্বপ্ন?

—সে কথা তোমায় বলতে পারবো না রাজর্ষি। উর্বশী বললে, ভয় নেই তোমার ওপর আর আমি অভিমান করবো না।

পুরূরবা এবারে মর্মর আসনে উপবেশন করে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করলেন উর্বশীকে। কিন্তু উর্বশীর দেহে আজ যেন এতটুকু উত্তাপ নেই। সরীসৃপের মতো শীতল তার শরীর। তবুও বললেন, চলো—দীর্ঘিকার ওধারে প্রমোদকক্ষে যাই।

—না।

—না কেন?

—বিশ্বাস করো, কোনো মান-অভিমান নয়, আজ আমি ক্লান্ত—রমণ-ক্রীড়ায় অসমর্থ আমি।

পুরূরবার মনের মধ্যে বিস্ময়, অনন্তযৌবনা উর্বশীর মুখে এ কি কথা!

উর্বশীর কথা তখনো শেষ হয়নি। বলছে, রাজর্ষি আমি তো কোনদিন কোনো অনুরোধ করিনি, শুধু আজ তোমাকে মিনতি জানিয়ে বলছি, আমাকে একা থাকতে দাও। অনেক বিরহ জ্বালা তো সহ্য করেছো, একটা রাতের বিরহ তার কাছে এমন কিছু নয়। তাছাড়া আরো একটা কথা, বিরহ প্রেমকে উজ্জীবিত করে।

এরপর আর কোনো কথা বলতে পারলেন না পুরূরবা, উদ্যান মধ্যে উর্বশীকে একা রেখে ফিরে এলেন আপন কক্ষে।

কিন্তু আপন কক্ষেও থাকতে পারলেন না পুরূরবা, কক্ষের বহির্দেশে অলিন্দে এসে বসলেন। এখান থেকে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম ক্ষেত্র স্পষ্ট দেখা যায়।

রাজর্ষির দেহে মনে এখন যত রাজ্যের অবসাদ। কিছু ভালো লাগছে

না তার। অথচ আশ্চর্য, মনের মধ্যে এখন বিরহজনিত যন্ত্রণা এতটুকু নেই। মনটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে।

কানে এলো সুমধুর সঙ্গীতের সুর। উদ্যানের দিক থেকে আসছে যাদুকরী সুর।

কে গাইছে! উর্বশী নয়তো!

রাজর্ষি অলিন্দ ত্যাগ করে আপন শয়নকক্ষে এলেন। শয়ন করলেন পালঙ্ক-শয্যায়। আজ পাশে উর্বশী নেই। দু-চোখ বন্ধ করে পুরূরবা শুনতে লাগলেন দূরাগত সঙ্গীত।

যাদুকরী সঙ্গীতের সুর হৃদয়কে স্পর্শ করছে।

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন রাজর্ষি।

মঞ্জীরধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল পুরূরবার। দেখলেন, অপূর্ব রূপসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে উর্বশী কক্ষে প্রবেশ করছে। মনে হচ্ছে মূর্তিমতী ঊষা তাঁর শয়নকক্ষের দ্বার প্রান্তে।

স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে বসলেন রাজর্ষি। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উর্বশীর দিকে। উর্বশীর রজতমঞ্জীর লাঞ্ছিত চরণযুগল সদ্য অলক্ত রাগে রঞ্জিত, জ্যোৎস্না রঙের স্বচ্ছ বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত তার তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দেহতনু। যদিও সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবরণ, কিন্তু বস্ত্রটি এমনই স্বচ্ছ যে তার দেহত্বকের রঙ অস্পষ্টতার মধ্যেও স্পষ্ট। যেন শরৎ কালের স্বচ্ছ কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা জ্যোৎস্নাস্নাত ধরিত্রী। পুরূরবা দেখছেন, উর্বশীর স্তনাবরণ বস্ত্রটিও অপূর্ব সূচীশিল্প সমন্বিত এবং শুভ্র মণিমুক্তা খচিত। উর্বশীর ত্রিভূজাকৃতি নাতিপ্রশস্ত ললাটদেশে সযত্ন-অঙ্কিত শ্বেত চন্দনলেখা, আর সীমন্তিনীতে প্রভাতের রক্তরাগ, এলায়িত অর্ধ-সিক্ত কেশগুচ্ছে শুধু একটি মাত্র গ্রন্থি। এলায়িত কেশদাম নিতম্বদেশ অতিক্রম করেছে।

উর্বশীর পদক্ষেপ মন্থর, কিন্তু ছন্দোময়। তার রক্তিম অধরে মৃদু হাসির স্পর্শ, তার কমলনিন্দিত নয়নে অধরের হাসি সংক্রমিত। তার দক্ষিণ হস্তটি ত্রিকোণ সৃষ্টি করে সামনে প্রসারিত, আর বাম হস্তটি আপন কটিদেশে।

পুরূরবার সামনে এসে নৃত্যের ভঙ্গিতে প্রণাম নিবেদন করলো উর্বশী।

মৃদু হেসে বললে, রাজর্ষির জয় হোক।

পুরূরবা তখনো দু চোখ ভরে দেখেছেন উর্বশীকে।

উর্বশী বললে, কী ভাবছো স্বামী?

পুরূরবা বললেন, স্বর্গলোক এতদিন কি করে উর্বশী বিরহ সহ্য করছে, তাই ভাবছি। ভাবছি, আমার কি সৌভাগ্য যে নারায়ণের এই অপূর্ব সৃষ্টি আজ আমার সাধ্বী পত্নী।

উর্বশী বললে, আমিও কম সৌভাগ্যবতী নই রাজর্ষি, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আমার স্বামী! যার প্রেম আমাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে, মর্যাদা দিয়েছে।

পুরূরবা স্পর্শ করলেন উর্বশীর চিবুক। বললেন, তোমাকে এমন স্নিগ্ধ রূপসজ্জায় কোনদিন দেখিনি উর্বশী—আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মূর্তিমতী ঊষা।

—কিন্তু ঊষা যে বড় ক্ষণস্থায়ী। জন্মলগ্নেই সূর্যের প্রখর দীপ্তি তাকে হরণ করে নেয়।

—না। সূর্যের প্রকাশ লগ্নের প্রাক মুহূর্তেই ঊষার আবির্ভাব। সূর্যের আগমন বার্তা তো সে-ই ঘোষণা করে।

—কিন্তু ঊষার অনুরাগ তো কখনো সূর্যকে রঙিন করে না! সূর্যের প্রতি ঊষার যত প্রণয়-অনুরাগ থাক না কেন, ঊষাকে কোনদিন সে প্রেম নিবেদন করে না। অথচ আবহমান কাল ধরে ঊষা সূর্যের পথ চেয়ে থাকে।

পুরূরবা এবারে নীরব।

—আমি যদি ঊষা হই, তাহলে আমি পূর্ণ রাজর্ষি। পুরূরবার জানুদেশে মুখ রেখে উর্বশী বললে, আমি সূর্যদেবকে পরিপূর্ণ রূপে পেয়েছি।

আপন করপুটে উর্বশীর মুখপদ্ম তুলে ধরলেন পুরূরবা। উর্বশীর দু-চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো।

রাজর্ষি পুরূরবার দেহে মনে এখন এক অপূর্ব রোমাঞ্চ-শিহরণ। এই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়লো, গত রাতে শোনা সুমধুর সঙ্গীতের কথা। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রাতে গান গাইছিলে উর্বশী?

—না। উর্বশী বললে, তবে আমিও শুনেছিলাম সে গান। আর সেই

গান শুনতে শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাজর্ষি ভাবলেন, তবে গভীর নিশীথে অমন সুধা ঝরা কণ্ঠে কে গাইছিল !

বাইরে অলিন্দদেশে যেন কার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

রাজর্ষি পুরূরবা দ্বার প্রান্তে গিয়ে দেখলেন। রানী ঔশীনরীর সহচরী নিপুণিকা আসছে।

রাজর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে নিপুণিকা বললে, দেবী আপনার দর্শন কামনা করেছেন। তিনি মন্দিরে আছেন।

—আমি যাচ্ছি।

নিপুণিকা চলে গেল। উর্বশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজর্ষি চললেন দেবী ঔশীনরী সকাশে।

দেবী ঔশীনরী মন্দির প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিলেন। পুরূরবা এসে রানীর পাশেই উপবেশন করলেন। বললেন, কোনদিন তো এমন সময় ডাক দাও না দেবী।

ঔশীনরী বললেন, কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করিনি নিশ্চয়ই ?

—না না, পুরূরবা বললেন, তুমি ডেকেছো—এতে অসুবিধের কথা উঠবে কেন !

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করবেন না।

পুরূরবা মৃদু হাসলেন। বললেন, দেবী তুমি কি ভুলে গিয়েছো—তুমি আমার প্রিয় পাটরানী ?

—স্বামীর অশেষ কৃপা। ঔশীনরী বললেন, আপনি তো জানেন, চিরদিনই একটা অভাববোধ আমার মধ্যে রয়েছে।

পুরূরবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন রানীর মুখের দিকে।

ঔশীনরী বিলম্বিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, জননী না হতে পারার যন্ত্রণা যে কী, আপনি তা উপলব্ধি করতে পারবেন না স্বামী।

—কিন্তু এ কথা কেন ?

—আমি চাই না চন্দ্রবংশে যতিচিহ্ন পড়ুক। রাজর্ষি—আপনি কি আমার

কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারছেন না ?

পুরূরবা মুহূর্তে উন্মনা হলেন। দেবী ঔশীনরী আজও জননী হতে পারেনি, উর্বশীর মধ্যেও সন্তান সম্ভাবনার কোনো লক্ষণ নেই—তবে কি চন্দ্রবংশ লোপ পাবে ? তবে কি ইতিহাস বলবে, রাজর্ষি পুরূরবা অপুত্রক ছিলেন।

পুরূরবা উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

উর্বশীর কক্ষে গিয়ে দেখলেন, উর্বশীর উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দূরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

—উর্বশী !

রাজর্ষির কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছয়নি উর্বশীর। যদিও দৃষ্টি তার সঙ্গমক্ষেত্রের দিকে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথাও উধাও হয়ে গেছে।

রাজর্ষি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন, পিছন থেকে হাত রাখলেন উর্বশীর বামস্কন্ধে।

—রাজর্ষি ! যেন চমকে উঠলো উর্বশী।

—কী ভাবছিলে উর্বশী ? নাম ধরে ডেকেও সাড়া পেলাম না। পুরূরবা বললেন, একটু আগে তোমাকে এক রূপে দেখে গেলাম, ফিরে এসে দেখছি আর এক রূপে—উর্বশী, তোমার মনের মধ্যে কি কোনো সুপ্ত ব্যথা আছে ?

—ছিল না, কিন্তু আছে। উর্বশী বললে, যে মুহূর্তে মর্তলোকে এসেছি, সেই মুহূর্ত থেকেই তো আমি মানবী। স্বর্গে ব্যথা বলে কিছু ছিল না। সেখানে তো আনন্দের চিরপ্রবাহ। এখন মানবী আমি, ব্যথাবোধ তো থাকবেই। ব্যথার অনুভূতি যে কত মধুর—সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। মর্তে এসে আমি ব্যথার স্বাদ পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা রাজর্ষি, আমি এখন সুখী।

রাজর্ষির বক্ষদেশে মস্তক স্থাপন করলো উর্বশী।

পুরূরবা ভুলে গেলেন, তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন উর্বশীকে।

আজকাল উর্বশীকে কিছুটা উন্মনা মনে হয়। মাঝে মাঝে প্রমোদ উদ্যানে নির্জন কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, কিংবা মণিহর্ম্যের শীর্ষদেশের

নিঃসঙ্গ কক্ষটিতে। আগে এই নির্জন-নিঃসঙ্গ কক্ষটিতে উর্বশী দু-দণ্ড স্থির ভাবে বসে থাকতে পারতো না পুরূরবা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। বলতো এই অবারিত আকাশ, এই নক্ষত্রের দেশের দিকে তাকালে আমার স্বর্গের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, এই মুহূর্তে কেউ যেন আমাকে জোর করে স্বর্গপুরে নিয়ে যাবে। আমি এখন মর্তের মৃত্তিকার কাছাকাছি থাকতে চাই।

অথচ সেই উর্বশী এখন একাকিনী মুহূর্ত যাপন করে মণিহর্ম্যের শীর্ষদেশের এই নিঃসঙ্গ কক্ষটিতে।

সেদিন গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে গেল পুরূরবার দেখলেন উর্বশী শয্যায় নেই। পড়ে আছে রজত মঞ্জীর।

উঠে পড়লেন পুরূরবা। কক্ষের ভিতরে বাইরে খোঁজ করলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন না উর্বশীকে।

প্রমোদ উদ্যান তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, উর্বশী এখানেও আসেনি। তবে কোথায় গেল সে! তবে কি গোপন অভিসারে গেছে!

না, না এ পাপ চিন্তা আমার সাজে না—নিজের মনকে নিজেই বোঝালেন পুরূরবা। তারপর উর্বশীর সন্ধানে সোপান পথে উঠে এলেন মণিহর্ম্যের শীর্ষদেশে।

এসেই দেখলেন, উর্বশী উন্মুক্ত আকাশের নিচে অর্ধ-শায়িত ভঙ্গিতে স্ফটিক জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উর্বশীর কাছাকাছি গেলেন পুরূরবা। দেখলেন, হাত দুটিতে দেহের ভার দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে উর্বশী। তার বেশ-বাস শিথিল এবং অবিন্যস্ত।

আরো কাছে গেলেন পুরূরবা, দেখলেন উর্বশীর মুখের রেখাগুলো ম্লান, চোখের কোণও কেমন যেন কালিমা লিপ্ত, তারপর দেহতনুও কেমন যেন শীর্ণ।

পুরূরবা আরো লক্ষ্য করলেন, উর্বশীর চোখ দুটি বন্ধ। বন্ধ দু চোখের কোণ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে। আর কণ্ঠের ফুলহার ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে

পড়েছে তার নাভিমূলে। কটিদেশ থেকে বস্ত্রাবরণ স্খলিত হয়েছে।

পুরূরবা মনে মনে বিচলিত বোধ করলেন। নানা দুশ্চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে। তবে কি স্বর্গলোক কিংবা গন্ধর্বলোক থেকে মায়াবিদ্যাবলে কেউ উর্বশী-সান্নিধ্যে আসে!

কিন্তু পুরূরবা মনকে বোঝালেন, উর্বশীর প্রেম নিখাদ, সেখানে কোনো ছলনা নেই।

আর স্থির থাকতে পারলেন না পুরূরবা। উর্বশীর নাম ধরে ডাকলেন।

চোখ মেলে তাকালো উর্বশী।

পুরূরবা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কেন?

উর্বশী বললে, ঘুম ভেঙে গেল, শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না—তাই চলে এলাম।

পুরূরবা বললেন, আজকাল তোমার মাঝে মাঝে কি হয় বলো তো?

উর্বশী তার কোমল বাহুলতায় বেষ্টন করলো পুরূরবাকে। বললে, নারী হৃদয়ের কিছু গোপন কথা তো থাকতে পারে প্রিয়। যে কথা একান্ত ভাবে তার নিজের। শুধু একটা বিশ্বাস রাখো, আমার হৃদয়-মন জুড়ে তুমি।

—চলো, পুরূরবা বললেন, আর এখানে নয়?

—কেন, এই তো বেশ। এখানে দুজনে মিলে জ্যোৎস্নায় অবগাহন করি।

উর্বশীর কথা শেষ হতে না হতে একটুকরো যাযাবর মেঘের অবগুণ্ঠনে চাঁদ ঢাকা পড়লো।

আজও সূর্য বন্দনা শেষে সোমদত্ত নামক বিমানে সৌরলোক থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন রাজর্ষি পুরূরবা।

আকাশ পথে প্রত্যাবর্তন কালে হেমকূট পর্বত-শিখর দৃষ্টি গোচর হতে তাঁর মনে পুরনো স্মৃতির উদয় হলো।

অপ্সরাগণের আর্ত চীৎকার এবং ক্রন্দন, তারপর দৈত্যের কবল থেকে

উর্বশী উদ্ধার—একের পর এক সব কিছু মনের পর্দায় ভেসে উঠলো ছবির মতো।

এই মুহূর্তে পূর্বস্মৃতি মন্থন করতে বেশ লাগছে তাঁর। মনে হয়, এই তো সেদিনের ঘটনা—যদিও তারপর বহুবার ঋতু চক্র আবর্তিত হয়েছে, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ মনে হয়, এই তো সেদিন।

উর্বশীকে প্রথম দেখার মুহূর্তের কথা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই সেই বিস্রস্তবসনা, স্খলিত অঞ্চলা উর্বশী, যার বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে মন্দার মালিকাটি স্পন্দিত হচ্ছিল—মনে পড়ছে সুরসুন্দরীর বক্ষদেশের সেই রক্তাক্ত রেখাগুলির কথা—দৈত্যের নখাগ্রের স্বাক্ষর। এখনো রাজর্ষি যেন স্পষ্ট দেখছেন, উর্বশীর পদ্মনিন্দিত নয়নদ্বয় থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে। অশ্রুবিন্দু নয়—যেন মুক্তাবিন্দু।

রাজর্ষি দু-চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে মনের মধ্যে বিচিত্র রোমাঞ্চ শিহরণ অনুভব করছেন।

সোমদত্ত এখন গিরিশিখর অতিক্রম করে ছুটে চলেছে প্রতিষ্ঠান নগরীর দিকে।

হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদে ফিরে এসেছেন পুরূরবা। এসেই ব্যস্তভাবে চললেন উর্বশীর কক্ষের দিকে। কিন্তু উর্বশী তার নির্দিষ্ট কক্ষে নেই।

কোথায় গেল উর্বশী!

ফিরে এলেন অলিন্দদেশে। দেখলেন, নিপুণিকা আসছে।

পুরূরবা ভাবলেন, নিপুণিকাকে জিজ্ঞাসা করেন উর্বশীর কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

নিপুণিকা অত্যন্ত চতুরা। তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে পুরূরবার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, রাজর্ষি বোধহয় তাঁর মানসীর খোঁজ করছেন?

—হ্যাঁ। জানো কোথায় সে?

—উদ্যানে পুষ্পচয়ন করছেন। বলে নিপুণিকা চলে গেল নূপুরের ধ্বনি তুলে।

পুরূরবা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে পুষ্পোদ্যানে এলেন। দেখলেন, সিক্ত বসনে স্বর্ণসাজি হাতে উর্বশী মনের আনন্দে পুষ্পচয়ন করে চলেছে।

পুষ্পচয়নরতা উর্বশীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পুরূরবা। বড় সুন্দর লাগছে এখন উর্বশীকে। অঙ্গে স্বচ্ছ কুয়াশার মতো সিক্ত বস্ত্রাবরণ। না আছে কাঁচলি বন্ধন, না আছে অন্তর্বাস। পুরূরবার চোখে উর্বশীর কোমল তনুর প্রতিটি রেখা স্পষ্ট।

এবারে ধীর পদক্ষেপে উর্বশীর কাছে গেলেন পুরূরবা। উর্বশী পুষ্পচয়নে ব্যস্ত, সে দেখতে পায়নি রাজর্ষিকে।

পুরূরবা পিছন থেকে উর্বশীর দু-চোখ চেপে ধরলেন। উর্বশী ভয় পেয়ে চমকে উঠলো। পড়ে গেল তার হাতের সাজি। চয়িত ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

—কি করলে বলো তো!

—এখনো তো অজস্র ফুল ফুটে আছে উর্বশী।

—থাক না। কিন্তু এমন সুন্দর ফুলগুলো বেছে বেছে তুললাম—উর্বশীর দু-চোখ ছলছল করে উঠলো।

—ওকি! সামান্য কটি ফুল পড়ে গেছে, তার জন্যে তোমার চোখে জল এসে গেল! উর্বশী, তুমি কি অবোধ বালিকা!

উর্বশী নীরব। মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পুরূরবা লক্ষ্য করলেন, উর্বশীর দু-চোখ দিয়ে জলবিন্দু ঝরে পড়ছে মাটিতে।

পুরূরবা বললেন, উর্বশী সত্যিই তুমি অবোধ বালিকা।

উর্বশী এবারে মুখ তুলে তাকালো। বললে, রাজর্ষি—তুমি কি জানো, আজ, এই দিনটি আমার কাছে কত স্মরণীয়। সূর্যোদয়ের আগে তুমি আকাশ রথে গেলে সূর্যপূজার জন্যে, আর আমি দীর্ঘিকায় অবগাহন করে সিক্ত বসনে পুষ্পচয়নে রত হলাম—এমন দিন তো রোজ আসে না স্বামী।

পুরূরবা বললেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা। কী এমন আছে আজ, যার জন্যে তুমি দীর্ঘিকায় স্নান করে সিক্ত বসনে পুষ্পচয়ন করছিলে?

—কিছু মনে পড়ছে না তোমার ? এত বিস্মৃতি ! আর আমি সারা বছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকি ।

পুরূরবা তবুও মনে করতে পারছেন না, আজ দিনটির সঙ্গে কোন্ মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বললেন, উর্বশী—তুমিই বলে দাও আজ দিনটি কেন স্মরণীয় ?

কিন্তু উর্বশীকে কিছু বলতে হলো না। পুরূরবার মনে পড়লো, ঠিক এই দিনটিতে উর্বশীকে তিনি দৈত্যের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। একটু আগেই সূর্যপূজা সমাপন করে সৌরলোক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সেদিনের ঘটনার কথা তাঁর স্মৃতিপটে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই দিনটি যে তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী আজ—একথা তাঁর মনে আসেনি ।

পুরূরবার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্বর্ণসাজিটি উর্বশীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চলো—দু জনে মিলে পুষ্পচয়ন করি। উর্বশী, বিশ্বাস করো—আকাশ পথে যখন আসছিলাম, তখন আমি সেই মধুর স্মৃতিই রোমন্থন করছিলাম। চোখের জল মুছে ফেল প্রিয়া—আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই ।

উর্বশীর মুখমণ্ডল এবারে হাসিতে ঝলমল করে উঠলো। লতাবিতানের অন্তরালে দাঁড়িয়ে উর্বশীর রক্তিম-অধর চুম্বনে সিক্ত করলেন পুরূরবা ।

লজ্জায় অধোবদন উর্বশী ।

ময়ূর-ময়ূরী কদম্ব তরুর নিচে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করলো ।

উর্বশী-পুরূরবা এবারে মনের আনন্দে পুষ্পচয়ন শুরু করলেন।

এক সময় পুরূরবা বললেন, আজ নিজের হাতে তোমাকে ফুল সাজে সাজাবো প্রিয়া ।

উর্বশী চটুল সুরে বললে, আর তোমাকে সাজাবে কোন্ সুন্দরী ?

—জানি না, কোন্ সুন্দরী আমাকে বরবেশে সাজাবে। পুরূরবা বললেন, আজ আমাদের পুষ্পবাসর রচিত হবে উদ্যানের এই প্রমোদ কক্ষে। আজ সুন্দরী উর্বশীর নৃত্যকলা দর্শন করবো এই বাসনা আমার ।

—যদি তাল ভঙ্গ হয় ?

—হয় হবে।

—যদি ছন্দপতন ঘটে!

—ক্ষতি নেই।

—যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

—আমার অঙ্কে বিশ্রাম নেবে। আমি তোমাকে আমার নিঃশ্বাস দিয়ে বীজন করবো।

—আর কিছু নয়?

—আর একটা ইচ্ছার কথা তোমাকে বারবার বলেছি, আজও বলছি—আজ মিলনসুখ যেন পরিপূর্ণ হয়।

মুহূর্তে উর্বশীর মুখের চেহারা বদলে গেল। তবু সহজভাবে বলতে চাইলো, তুমি কি সুখী নও স্বামী–তুমি কি মিলনে কোনোদিন পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করনি?

—আমার ঈপ্সিত আনন্দ পূর্ণ হয়েছিল একদিন, যেদিন গন্ধমাদন বন থেকে আমরা মেঘলোকের মধ্যে দিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করি। সেই একটি দিন আকাশ রথে তুমি সম্পূর্ণ ভাবে আমাতে আত্ম সমর্পণ করেছিলে।

উর্বশীর সর্বাঙ্গ কেমন কন্টকিত হলো। মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। বললে, রাজর্ষি আমি জানি তোমার দুঃখ কোথায়। কিন্তু দুঃখ কোরো না, আমি জানি দেবরাজের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।

উর্বশীর মুখে হঠাৎ দেবরাজের নাম শুনে কিছুটা অবাক হলেন পুরুরবা। ভেবেই পেলেন না, এই পুষ্প চয়ন কালে ইন্দ্রের কথা মনে এলো কেন উর্বশীর!

পুরূরবা শুনেছেন আচার্য ভরতের অভিশাপের কথা। যে অভিশাপ শুধু উর্বশীর কাছেই নয়, পুরূরবার ওপরেও ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। সেদিন ভরতের অভিশাপে উর্বশী স্বর্গভ্রষ্টা না হলে, কোনোদিনই সুর সুন্দরীর সঙ্গে মিলন সম্ভব হতো না।

কিন্তু ইন্দ্রের আশীর্বাদ ছিল ছলনা মাত্র। আশীর্বাদের মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন অভিশাপ—যে কথা কোনদিন পুরূরবার কাছে প্রকাশ করেনি উর্বশী।

—কী ভাবছো উর্বশী! পুরূরবা বললেন, তোমাকে চিন্তিত দেখলে

আমি মনের দিক থেকে অসহায় বোধ করি।

—রাজর্ষি, এমন কেউ আছে না থাকতে পারে, যার চিন্তা নেই। উদ্যানের কোণের দিকে তাকিয়ে উর্বশী উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠলো, রাজর্ষি ওই দেখ, কী সুন্দর ফুল ফুটে আছে ওই গাছটায়।

—চলো উর্বশী। পুরূরবা দেখলেন, উদ্যানের কোণে অজস্র কুন্দ প্রস্ফুটিত হয়েছে। শুভ্রকান্তি কোমল কুন্দ—সহজেই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

ইন্দ্রের প্রসঙ্গে উর্বশীও আর তুললো না, পুরূরবাও জানতে চাইলেন না।

কুসুমনির্যাস-নিসিক্ত জলে গাত্র মার্জনা করলো উর্বশী। নিপুণিকা তার করবী রচনা করে দিলে। তারপর উর্বশী এলো রাজর্ষি সকাশে প্রমোদ কক্ষে।

রাজর্ষির ইচ্ছা আজকে নিজের হাতে সাজাবেন উর্বশীকে।

নিভৃত প্রমোদ কক্ষে উর্বশীকে সাজাতে বসলেন পুরূরবা। কিন্তু সাজাতে গিয়ে ভাবলেন, উর্বশীর সুঠাম অবয়ব সাজাবার অপেক্ষা রাখে না। তিনি সাজাবেন কি—অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইলেন উর্বশীর মুখের দিকে।

উর্বশী বললে, কি হলো—সাজাবে না!

পুরূরবা বললেন, আগে দু চোখ ভরে দেখতে দাও উর্বশী।

উর্বশী হাসলো। তার হাসিতে মৃদু ঝংকার।

এবারে তুলিকা দিয়ে উর্বশীর পদযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করতে বসলেন পুরূরবা। স্বামীকে বারবার নিষেধ করলে উর্বশী, 'তুমি আমার চরণ স্পর্শ কোরো না'—কিন্তু পুরূরবা তার কথা কানে নিলেন না—তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা প্রিয়া উর্বশীকে নিজের মনের মতো করে সাজাবেন।

নিজের হাতে উর্বশীর কাঁচলি বেঁধে দিলেন, চন্দনে চিত্রিত করলেন পয়োধর যুগল, ললাট দেশে এঁকে দিলেন কুঙ্কুম বিন্দু—নিপুণ শিল্পীর মতো উর্বশীকে সাজালেন পুরূরবা।

উর্বশীকে অপূর্ব রূপসজ্জায় সজ্জিত করেছেন পুরূরবা। উর্বশী পালঙ্কের একান্তে বসে আছে। পুরূরবা দেখছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

কিন্তু কক্ষের বাতায়ন পাশে একটা বায়স কর্কশস্বরে ডেকে উঠলো। শুধু পুরূরবা নয় উর্বশীর মনটাও দুলে উঠলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, এখন বায়সের ডাক কেন। পুরূরবা মনকে বোঝালেন, জ্যোৎস্নালোকে হয়তো বায়স ভুল করেছে, ভেবেছে দিনের আলো আছে। উর্বশীকে সেই কথা বোঝালেনও। কিন্তু উর্বশীর মন এখন আসন্ন অমঙ্গল চিন্তায় কাতর।

পুরূরবা বললেন, চিন্তা কিসের উর্বশী! কোনো অমঙ্গল আমাদের স্পর্শ করবে না। এসো আমরা আমাদের পুষ্পশয্যা রচনা করি।

—এরই মধ্যে! উর্বশী বললে, তুমি না বলেছিলে আজ আমার নৃত্যকলা দর্শন করবে।

—দেখ, পুরূরবা বললেন, মন এখন রমণক্রীড়ার জন্যে এমনই উন্মুখ যে, ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা।

উর্বশী মৃদু হেসে বললে, আমার দেহ-সুধা পান করার এমন অদম্য ইচ্ছা কেন রাজর্ষির? এ দুর্বলতা তোমার মতো বীর্যবানের সাজে না।

পুরূরবা বললেন, আমার মনের ওপর তুমি এমনই ছায়াপাত করে আছো, যে ছায়া কখনো অপসৃত হবার নয়।

উর্বশী বললে, ছায়া তো কায়াকেই অনুসরণ করে রাজর্ষি।

পুরূরবা বললেন, আমরা যদি সূর্যের বিপরীতে অগ্রসর হই, তখন তো ছায়াকেই অনুসরণ করি উর্বশী।

উর্বশী বললে, তা সত্যি। যাক, এখন চলো—আমরা কক্ষের বাইরে যাই। চন্দ্রিমাবিধৌত উদ্যানে হোক আমাদের মধুচন্দ্রিমা।

—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক উর্বশী। চলো।

মৃদু মঞ্জীর ধ্বনি তুলে উর্বশী ছন্দোময় পদক্ষেপে এগিয়ে চললো। পিছনে পুরূরবা। তাঁর দৃষ্টি উর্বশীর রথচক্রতুল্য গুরু নিতম্ব দেশে। পদ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর নিতম্বদেশ আন্দোলিত হচ্ছে।

পুরূরবার দেহ-মন এখন রতিরসে ভরপুর।

দীর্ঘিকার মর্মর সোপানে এসে উপবেশন করলো উর্বশী। আর পুরূরবা কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে উর্বশীকে দেখছেন, আর মনে মনে ভাবছেন—এক অঙ্গে এত রূপ, নারায়ণের কী অপূর্ব সৃষ্টি।

সোপানে দেহটা তির্যক ভঙ্গিতে পিছনে হেলিয়ে দিয়ে উর্বশী আপন মনে চরণদ্বয় সঞ্চালন করে নূপুরের ধ্বনি তুলছে।

পুরূরবার হৃদস্পন্দন ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে, নিঃশ্বাসও গাঢ় হয়ে আসছে। রতিরসের প্লাবনে প্লাবিত হচ্ছে তাঁর দেহমন। এই মুহূর্তে উর্বশীর নাম ধরে ডাকতেও তিনি অক্ষম।

উর্বশী নৃত্যের ছন্দে উঠে দাঁড়ালো। ঝংকৃত হলো মঞ্জীর, অলক্তরঞ্জিত চরণদ্বয়ে অপূর্ব ছন্দ সৃষ্টি করে সোপানের মর্মর চত্বরে নৃত্য শুরু করলো।

পুরূরবার চিত্ত আরো চঞ্চল হলো।

নৃত্যের ছন্দে সর্বাঙ্গে তরঙ্গ সৃষ্টি করে উর্বশী এগিয়ে আসছে পুরূরবার দিকে। পুরূরবা তখনো প্রস্তর মূর্তির মতো একই জায়গায় দণ্ডায়মান।

উর্বশী এবারে পুরূরবার বক্ষদেশে মস্তক স্থাপন করলো। কিন্তু পুরূরবা যে মুহূর্তে তাকে আলিঙ্গনে বন্দী করতে যাবেন, তখনই উর্বশী সরে এলো। চপলছন্দে চলে গেল উদ্যানের কদম্ব তরুর নিকটে। যেখানে জ্যোৎস্না স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

পুরূরবা যখনই উর্বশীকে ধরতে যান, তখনই উর্বশী চপল ছন্দে দূরে সরে যায়। কিছুতেই ধরা দিতে চায় না উর্বশী। পুরূরবার সঙ্গে সে আজ খেলায় মেতেছে।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হলো।

এবারে উর্বশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গ তার ঘর্মাক্ত। আর সে পারছে না। শ্যামল দূর্বাদলের ওপর শুয়ে পড়লো। বক্ষদেশ থেকে বস্ত্রাঞ্চল সরিয়ে দিলে, শিথিল করলে কাঁচলির বন্ধন, কটিদেশের বস্ত্রগ্রন্থি।

পুরূরবা কাছে এলেন। ঝুঁকে পড়লেন উর্বশীর মুখের ওপর।

উর্বশী বললে, রাজর্ষি আমি ক্লান্ত।

পুরূরবা বললেন, আমাদের সযত্ন রচিত পুষ্পশয্যা কি শূন্য থাকবে ?

উর্বশী বললে, থাক না—এই তো বেশ প্রকৃতির কোলে শুয়ে আছি। আকাশে চাঁদ আলো দিচ্ছে, পবনদেব বীজন করছে, পুষ্পের সুরভি মিশে আছে বাতাসে—নাই বা গেলাম কক্ষে।

পুরূরবা এবারে রতি সুখ সাগরে অবগাহনের বাসনা নিয়ে কোমলতনু উর্বশীকে কোলে তুলে নিলেন।

উর্বশীর হৃদস্পন্দন এখন দ্রুত, নিঃশ্বাস ভারী—তার প্রতিটি অঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পুরূরবা এখন সুখ-সমুদ্রে অবগাহন করছেন।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে আজ ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান নগরীতে আজ উৎসবের সমারোহ। রাজধানীর অগণিত নরনারী এসেছে সঙ্গমক্ষেত্রে।

রাজধানীর বাইরে থেকেও অনেকে এসেছে এই উৎসব-অনুষ্ঠানে। সপার্ষদ রাজা পুরূরবাও এসেছেন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে।

সুসজ্জিত মণ্ডপ থেকে পুরূরবা এই উৎসব প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁকে ঘিরে মন্ত্রীবর্গ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

রানী এবং পুরনারীদের জন্যে স্বতন্ত্র মণ্ডপ।

রাজর্ষি পুরূরবা হৃষ্টচিত্তে উৎসব প্রত্যক্ষ করছেন। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো। উর্ধ্ব আকাশ থেকে একটি গৃধ্র দ্রুত নেমে এলো, এবং পলকের মধ্যে পুরূরবার রাজমুকুটের রক্তাভ সঙ্গমমণিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

রাজর্ষি আসন ত্যাগ করলেন। তাঁর মন অজানা শংকায় দুলে উঠলো। সঙ্গমমণি-হারা জীবনে আবার না দুঃসহ বিরহের দিন ফিরে আসে।

—সেনাপতি, আমার ধনুর্বাণ।

সেনাপতি মণ্ডপেই ছিল; ধনুর্বাণ হাতে এগিয়ে এলো। ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে উর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকালেন পুরূরবা। দেখলেন, উর্ধ্ব আকাশে উড়ন্ত গৃধ্রটির দীর্ঘ চঞ্চুতে সঙ্গমমণিটি রক্তাভ দ্যুতি বিকিরণ করছে।

—ওই চৌর্যবৃত্তি পরায়ণ গৃধ্রকে আমি বধ করবো। বলে ধনুকে তীর যোজনা করলেন পুরূরবা।

গৃধ্র তখন উর্ধ্ব আকাশের দিকে ধাবিত হয়েছে। উড়ন্ত গৃধ্রকে তীর

বিদ্ধ করা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া গৃধ্র এখন উর্ধ্ব আকাশে—তীর অত দূর পৌছবে কিনা সন্দেহ।

পুরূরবা দেখছেন, স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মণিটি গৃধ্রের ওষ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু গৃধ্রটি যে ভাবে উর্ধ্ব আকাশের দিকে চলেছে, তাতে এখান থেকে স্থির নিশানা করাই দায়।

তবু তীর নিক্ষেপ করলেন পুরূরবা। কিন্তু তীর গৃধ্রটিকে স্পর্শ করলো না। বারবার তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কোনো তীরই লক্ষ্যে পৌছলো না।

কঞ্চুকী পাশেই ছিল পুরূরবার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে বললে, রাজর্ষি কি ওই মণিটির জন্যে কাতর হয়ে পড়লেন? কিন্তু এ কাতরতা কেন! রাজভাণ্ডারে তো মূল্যবান মণিরত্নের অভাব নেই।

—কঞ্চুকী তোমাকে বোঝাতে পারবো না ওই মণিটি কত দুর্লভ। ওই মণিটি আমার হৃদপিণ্ডের চেয়ে মূল্যবান। তুমি এবং সেনাপতি —তোমরা দুজনেই যাও—কিরাতকুলকে নির্দেশ দাও, সন্ধ্যা আসন্ন—গৃধ্র সমূহ এমনই নীড়ে ফিরবে—কিরাতেরা যেন গৃধ্রের নীড় সমূহে ওই চৌর্য বৃত্তি পরায়ণ গৃধ্রটির সন্ধান করে।

বিদূষক এত সময় কোনো কথা বলেননি, এবারে রাজর্ষি-সন্নিধানে এসে বললেন, রাজর্ষি আমি কি একটা কথা নিবেদন করতে পারি?

পুরূরবা বিদূষকের মুখের দিকে তাকালেন।

—মণিটির মধ্যে এমন কি রহস্য আছে, যার জন্যে আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন? বিদূষক বললেন, তাছাড়া আপনি নির্দেশ দিলেন, সন্ধ্যার পর যেন গৃধ্রকুলের নীড় সমূহ কিরাতেরা অন্বেষণ করে সেই তস্কর গৃধ্রটির কাছ থেকে যেন অপহৃত মণিটি উদ্ধার করে। কিন্তু রাজর্ষি কি জানেন না, গৃধ্রেরা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে অবস্থান করে—এবং সকল বৃক্ষ চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মণিটিকে গলাধঃকরণ কিংবা যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়াও গৃধ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়। রাজর্ষির কাছে মণিটি যত দুর্লভ হোক, একটি গৃধ্রের কাছে ওটির কোনো মূল্য নেই।

—তবুও কিরাতেরা তৎপর হোক, এটা আমার ইচ্ছা। বলে পটমণ্ডপ ত্যাগ করলেন পুরূরবা।

কিন্তু মনের মধ্যে নিদারুণ দুশ্চিন্তা—না জানি আবার কোন্ অন্ধকার মুহূর্ত অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

রাজপ্রাসাদে ফিরছেন পুরূরবা। ইতিমধ্যে উর্বশীও শুনেছে সঙ্গম মণিটির কথা।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনের মধ্যে চিন্তা—সে ধরেই নিয়েছে এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে দেবরাজের ইচ্ছা। নয়তো মৃত পশু-মাংসলোভী গৃধ্র একটি মণিকে মাংসভ্রমে ছোঁ মেরে নেবে কেন?

রাজর্ষি পুরূরবা পদব্রজে প্রাসাদের দিকে চলেছেন, আর উর্বশী চলেছে সুসজ্জিত শিবিকায়।

উর্বশীর শিবিকা আগে ভাগেই রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।

প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পুরূরবা ভাবলেন, মণিহারা হয়ে নাই-বা ফিরলেন প্রাসাদে। এরচেয়ে ভালো অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

তবু কিছুক্ষণ প্রাসাদের বহির্দেশে অপেক্ষা করলেন রাজর্ষি। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন রাজর্ষি। অমাত্য বর্গ সঙ্গেই সঙ্গেই আছেন। প্রিয় বিদূষক তো পাশে পাশেই চলেছে।

প্রাসাদের প্রধান তোরণ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একযোগে দেখলো, একটি গৃধ্র বাণ বিদ্ধ হয়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে পতিত হলো। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে সবাই দেখলো, গৃধ্রটির চঞ্চুতে সেই রক্তিম মণিটি রয়েছে।

বাণবিদ্ধ গৃধ্রটি দীর্ঘ পক্ষ বিস্তার করে প্রাণত্যাগ করলো।

গৃধ্রটির বক্ষে এখনো বাণটি বিদ্ধ হয়ে আছে।

রাজা বিস্মিত হলেন, কে এই ধনুর্ধর, যার বাণ দূর-আকাশে উড্ডীয়মান গৃধ্রটিকে বিদ্ধ করেছে। এমন অব্যর্থ নিশানা কার!

কঞ্চুকী মৃত গৃধ্রটির দিকে এগিয়ে গেল। বললে, মহারাজ বাণের পুচ্ছদেশে ত্রিকোণাকৃতি একটি ফলক—ওখানে বেশ কয়েকটি অক্ষর ক্ষোদিত আছে দেখছি।

বিদূষক বললেন, পড়েই দেখ না কি লেখা আছে।

কঞ্চুকী বিদ্ধ বাণটি হাতে তুলে নিলেন। অক্ষরগুলিতে চোখ বুলিয়ে

বললে, আমি পাঠোদ্ধারে অক্ষম। সন্ধ্যা আসন্ন, এই ক্ষীণ আলোকে আমি অক্ষরগুলি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়।

এবারে বিদূষক বাণটি হাতে নিলেন। তাঁরও মুখে প্রায় একই কথা শোনা গেল।

পুরূরবা অনুমান করলেন, বাণে এমন কিছু লেখা আছে, যা পাঠ করেও ওরা ব্যক্ত করতে অক্ষম।

—আমি পাঠ করছি, এবং সকলকে শুনতে অনুরোধ করছি, পুরূরবা সোচ্চারে পাঠ করলেন, এই বাণ শত্রুহননে পারদর্শী কুশলী ধনুর্ধর উর্বশীর গর্ভজাত সন্তান আয়ুর।

উপস্থিত সকলে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত। উর্বশীর পুত্র আয়ু! আশ্চর্য!

রাজর্ষি পুরূরবা বাণটি হাতে নিয়ে স্থিরমূর্তির মতো দণ্ডায়মান।

কঞ্চুকী গৃধ্রের ওষ্ঠদেশ থেকে মণিটি নিয়ে জলে ধৌত করে রাজর্ষিকে দিয়ে বললে, মহারাজ এ-তো আনন্দের কথা। আপনি অপুত্রক ছিলেন বলে রাজ্যবাসীর মনে একটা বেদনা ছিল। আর এই বেদনা তো আপনাকে অহরহ পীড়িত করতো।

পুরূরবার কানে এখন কোনো কথাই পৌছচ্ছে না। এমন নাটকীয় মুহূর্ত যে তাঁর জীবনে আসবে, এ তিনি কল্পনাও করেননি।

উর্বশীর সন্তান—কি করে সম্ভব! তিনি তো প্রতিনিয়ত উর্বশী সান্নিধ্যে দিনাতিপাত করেছেন, কিন্তু কখনো তো তাকে সন্তান সম্ভবা মনে হয়নি। তাছাড়া তিনি তো প্রতি নিশীথে রমণ ক্রীড়ার রত হওয়ার আগে উর্বশীকে বলতেন, 'উর্বশী তুমি উপযুক্ত সন্তানের জননী হও।' কিন্তু এ কথা শুনেই উর্বশী বিচলিত হয়ে বলতো, 'না রাজর্ষি—সে হয় না, হবার নয়।'

তবে?

তবে কি এই ধনুর্ধরের পরিচয় মিথ্যা!

নিশ্চয়ই মিথ্যা। হয়তো উর্বশীর বিরহে কাতর ইন্দ্রের ছলনা এটা।

কিন্তু দেবতারা তো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

রাজর্ষির চিন্তা এখন বিচিত্র পথগামী। কখনো ভাবছেন, এই ধনুর্ধরের পরিচয় মিথ্যা, কেউ কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এই কাজ করেছে। কখনো

ভাবছেন, হয়তো উর্বশী তাঁকে সত্য গোপন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবছেন, যদিও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ গোপন রাখতে পারে কিন্তু সকলের অগোচরে কি সন্তান প্রসব সম্ভব! আর তা-ও যদি হবে, তবে এই সন্তান এতদিন কোথায় ছিল? এই ধনুর্ধর বীর নিশ্চয়ই নিতান্ত বালক নয়, কেননা একজন বালক কখনো ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে না।

রাজর্ষি আরো ভাবলেন, বাণে মাতৃ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু পিতৃ পরিচয় নেই কেন! তবে কি—

না, এরপর আর কিছু ভাবতে পারেন না পুরূরবা।

বিদূষক অনুমান করেছেন প্রিয় রাজর্ষির মানসিক অবস্থার কথা। বললেন, মহারাজ অহেতুক চিন্তা করছেন কেন? যদি ধনুর্ধরের এই পরিচয় সত্য হয়, তাহলে সে তো রাজর্ষির কাছে পরম আনন্দের। আপনি বীর্যবান সন্তানের জনক—রাজ্যের পক্ষেও এটা সুসংবাদ।

পুরূরবা কোনো কথাই বললেন না, শুধু একবার বিদূষকের মুখের দিকে তাকালেন মাত্র।

বিদূষক বললেন, আজ তো পরম আনন্দের দিন। এখন মহারাজের উচিত এই বাণ নিক্ষেপকারী বীরের সন্ধান করা।

পুরূরবার মনে তখনো সেই এক চিন্তা—উর্বশী কি সত্যই বীরপুত্রের জননী! বললেন, সবই বুঝতে পারছি বিদূষক, কিন্তু আমার মনে যে কেমন ধন্দ লাগছে।

—কিসের ধন্দ রাজর্ষি?

—উর্বশী মা হলো, আর আমি কিছুই জানি না। বিদূষক, আমি কোনো যুক্তিতর্ক দিয়ে মনকে বোঝাতে পারছি না। সকলের অজ্ঞাতসারে এমন ঘটনা কি করে ঘটতে পারে! আমার মনে হয়, এই ঘটনার নেপথ্যে কোনো রহস্য আছে। যে রহস্যজাল আমাকে ছিন্ন করতে হবে। প্রিয় বিদূষক, তুমি কি কিছু অনুমান করতে পারছো?

বিদূষক বললেন, রাজর্ষি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে কয়েকটা কথা বলতে পারি।

—বলো কি বলবে।

রাজর্ষিকে একান্তে ডেকে বিদূষক বললেন, রাজর্ষি নিশ্চয়ই একথা বিস্মৃত হননি যে, আপনার প্রিয় জীবন-সঙ্গিনী উর্বশী একজন অপ্সরা। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, অপ্সরারা নানা রকম গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শিনী। ওরা কখনো অভিনয় পটিয়সী, কখনো ছলনাময়ী।

বিদূষকের কথা পুরূরবাকে ভাবিয়ে তুললো। তবু তিনি মানতে পারছেন না—উর্বশী সন্তানের জন্ম দিয়েছে, উর্বশী তাঁকে ছলনা করেছে। উর্বশীর প্রেমে তো খাদ ছিল না।

এই মুহূর্তে একজন দ্বাররক্ষীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। শুধু পুরূরবা নয়, সকলের দৃষ্টি এখন রক্ষীর দিকে।

রাজর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে রক্ষী বললে, মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম থেকে একজন তাপসী ধনুর্ধর এক কুমারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

পুরূরবা মনে মনে কিছুটা বিস্মিত হলেন। বললেন, যাও তাদের সসম্মানে ভিতরে নিয়ে এসো।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ, বলে রক্ষী চলে গেল।

শুধু পুরূরবা নয়, উপস্থিত সকলের মনেই অদম্য কৌতূহল, সকলেরই দৃষ্টি এখন প্রবেশ পথের দিকে। সকলেই ভাবছেন, এরপর না জানি কী কথা শুনতে হবে!

গৈরিক বসন পরিহিতা তাপসী সত্যবতী প্রবেশ করছেন। পিছনে সৌম্য দর্শন এক পরিণত কিশোর, যার হাতে ধনুর্বাণ। রাজকীয় ভঙ্গিতে কিশোর এগিয়ে আসছে।

কিশোর কুমারকে দেখা মাত্র পুরূরবার হৃদয়-মন উদ্বেলিত হলো। বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হলো তাঁর দেহ-মন জুড়ে।

রাজর্ষি দেখছেন, এই কুমার কিশোর যেন তাঁরই প্রতিরূপ।

উপস্থিত সকলেই একবার রাজর্ষিকে দেখছেন, একবার ধনুর্বাণধারী কুমারকে দেখছেন।

আর পুরূরবার হৃদয় এখন অনাস্বাদিত বাৎসল্যরসে বিগলিত, চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত আর স্নায়ু রাজ্যে আনন্দ শিহরণ। মনের মধ্যে বিস্মিত জিজ্ঞাসা,

তাঁরই প্রতিরূপ কে ওই কুমার! আর ওকে দেখে চিত্ত এমন উদ্বেলিত হচ্ছে কেন?

তাপসী সত্যবতী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে রাজর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, মহারাজের মঙ্গল কামনা করি। আমি আসছি মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম থেকে এবং আপনাকে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।

পুরূরবা বললেন, আসুন—এখানে নয়, আপনি অতিথি কক্ষে চলুন। সেখানেই শুনবো আপনার কথা।

তাপসী সত্যবতী এবং ধনুর্বাণধারী কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে পুরূরবা অতিথি কক্ষে এলেন। সবিনয়ে বললেন, আপনি আসন গ্রহণ করুন।

তাপসী সত্যবতী আসন গ্রহণ করলেন। কুমার তখন বিস্মিত দৃষ্টিতে চারদিকে দৃষ্টিপাত করছে। আশ্রমলালিত কুমার, কখনো রাজগৃহ দেখেনি।

সত্যবতী এবারে কুমারকে ডাক দিয়ে বললেন, কুমার আয়ু রাজর্ষিকে প্রণাম করো।

কুমার আয়ু প্রণাম করলো রাজর্ষিকে। রাজর্ষি পুরূরবা কেমন যেন স্থির। স্নেহ জানাতেও পারলেন না। তাপসী সত্যবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, মহর্ষি চ্যবন আমার কাছে দেবতা স্বরূপ, আপনি মহর্ষির আশ্রমিকা—আমার কাছে মাতৃস্বরূপা—বলুন, আপনি এই কুমারকে নিয়ে কেন এসেছেন?

সত্যবতী বললেন, রাজর্ষির সংযমের প্রশংসা করি। যাক, আমার কথাগুলি এখন আপনি মন দিয়ে শুনুন। উর্বশীর গর্ভজাত এই সন্তানের পিতা আপনি। আপনি একে গ্রহণ করুন।

—কী বলছেন আপনি!

—যা বলছি, এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। রাজর্ষি, অহেতুক মিথ্যা ভাষণে আমার প্রয়োজন কি। যা সত্য, তা অকপটে নিবেদন করছি।

পুরূরবার হৃদয় যতই উদ্বেলিত হোক, এই মুহূর্তে তার বহিঃপ্রকাশ নেই। বললেন, আমি যদি একথা অস্বীকার করি।

সত্যকে অস্বীকার করা যায় না রাজর্ষি। সত্যবতী মৃদু হেসে বললেন, রাজর্ষি কি কুমার আয়ুকে ভালো করে লক্ষ্য করেছেন! আমার তো মনে হচ্ছে, কুমার আয়ু মহারাজেরই প্রতিরূপ। এরপরেও যদি

কিছু শুনতে চান, শুনুন—একদিন গভীর রাত্রে উর্বশী তার সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে মহর্ষির আশ্রমে যায়। এবং সদ্যোজাত সন্তানকে মহর্ষির পদপ্রান্তে রেখে বলে, মহর্ষি—আমার এই সন্তান আপনাকে দিলাম, আপনি একে লালন করুন। মহর্ষি তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উর্বশীকে বললেন, তুমি সত্যবতীর সঙ্গে কথা বলো। তারপর উর্বশী তার সন্তানটিকে আমার ক্রোড়দেশে দিয়ে বলে, এই সন্তান—এর দায়িত্ব আপনার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই শিশু, এর পরিচয় কি? তখন সে এই শিশুর পরিচয় দিয়ে বলেছিল, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজর্ষি পুরূরবা এর পিতা, আর ইন্দ্রলোকের উর্বশী এই আমি এর জননী। আমি বলেছিলাম, কিন্তু একে এভাবে পরিত্যাগ করছো কেন? সে কথায় উর্বশী কোনো কথা বলেনি। শুধু অধোবদন হয়ে অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করেছিল।

—তারপর? পুরূরবা মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

—তারপর আর কি বলবো রাজর্ষি, উর্বশী আমাকে মিনতি জানিয়ে বলেছিল, আমি যেন এর পরিচয় গোপন রাখি। আমি আর আমাদের গুরুদেব ছাড়া এই কুমার আয়ুর পরিচয় অন্য কেউ জানে না।

পুরূরবা এখন রীতিমত বিচলিত। কক্ষে উপস্থিত যাঁরা, তাঁরাও বিস্ময়ে হতবাক। আর কুমার আয়ুও তখন পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

সমবেত প্রিয় সুহৃদবৃন্দের মুখের দিকে তাকালেন পুরূরবা। কিন্তু কুমার আয়ুর দিকে যখনই চোখ পড়ছে, তখনই তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছে। ভাবছেন আর কোনো কথা নয়, কুমার আয়ুকে বক্ষদেশে আকর্ষণ করে অশান্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করেন। কিন্তু পারছেন না।

আশ্রমিকা সত্যবতী বলতে লাগলেন, রাজর্ষি আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। মহর্ষি চ্যবন এই রাজকুমারকে সর্বপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। কুমার আয়ু সর্বপ্রকার বিদ্যা সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করেছে। এমন কি ধনুর্বিদ্যাতেও কুমার রীতিমত পারদর্শী। কিন্তু এই কুমার আজ আশ্রমের চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করেছে। আশ্রমক্ষেত্র থেকে একটি গৃধ্রকে কুমার অকারণে বাণবিদ্ধ করেছে। ওই গৃধ্র আশ্রমের শত্রু নয় কিংবা আশ্রমের কোনো ক্ষতি সাধন করেনি।

পুরূরবা হঠাৎ বলে উঠলেন, কুমার ঠিকই করেছে, মৃত গৃধ্র তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। গৃধ্রটি আমার মুকুট থেকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রত্নটি অপহরণ করেছিল। কুমার আয়ুকে এজন্যে আমি সাধুবাদ জানাই।

সত্যবতী হাসলেন। বললেন, গৃধ্র যেমন আপনার রত্ন অপহরণ করে অপরাধ করেছে, তেমনি একজন আশ্রমিক গৃধ্রটিকে বধ করে আশ্রমের রীতি-নীতি লঙ্ঘন করেছে। রাজধর্ম আর আশ্রম- ধর্ম এক নয়।

—বুঝেছি। পুরূরবা বললেন, তারপর?

—মহর্ষির নির্দেশেই আমি রাজর্ষি-সমীপে কুমার আয়ুকে নিয়ে এসেছি।

—বলুন আমি কি করতে পারি?

—আপনার কি করণীয় সে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাপসী সত্যবতী বললেন, যদিও রাজর্ষি এই কুমারের জনক, তবু আমি কুমারকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই না, আমি চাই উর্বশী এসে তার সন্তানকে গ্রহণ করুক। আপনি উর্বশীকে একবার ডাকুন।

—উর্বশীকে কেন?

—উর্বশীই তার সন্তানকে রেখে এসেছিল আশ্রমে, আমি একে তারই হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাই।

এই সময় কুমার আয়ু এসে তাপসী সত্যবতীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে, মা—আমি তোমাকেই চিনি—মাগো, তুমি আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। একটি গৃধ্রকে বধ করে আমি যে পাপ করেছি, আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমি রাজপুত্র নই—আমি অজ্ঞাতকুলশীল আশ্রম লালিত এক হতভাগ্য কিশোর।

তাপসী সত্যবতী বুঝিয়ে বললেন, বৎস, রাজর্ষি তোমার পিতা—তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সসাগরা পৃথিবীর সিংহাসন।

কুমার আয়ু অশান্ত কান্নায় আকুল হয়ে বললে, আমি চাই না সিংহাসন, আশ্রমের দর্ভাসনই আমার কাম্য। মা, আমি এই মুহূর্তে রাজগৃহ ত্যাগ করতে চাই। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

তাপসী সত্যবতী আবার মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, সন্ধ্যা আসন্ন—আমাকে ফিরে যেতে হবে আশ্রমে। আপনি উর্বশীকে একবার

ডেকে পাঠান।

কঞ্চুকী একান্তে দাঁড়িয়েছিল। রাজর্ষি তাকে ডেকে বললেন, যাও কঞ্চুকী—উর্বশী হয়তো এখন বিশ্রাম কক্ষে আছে, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে তাকে এই সংবাদটুকু পাঠানোর ব্যবস্থা করো—জানাবে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম থেকে আশ্রমিকা সত্যবতী এসেছেন মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে—সে যেন কালবিলম্ব না করে অতিথি কক্ষে আসে।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ, বলে কঞ্চুকী অতিথি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

অতিথি কক্ষ জুড়ে এখন এক বিচিত্র নীরবতা। কারো মুখে কোনো কথা নেই—শুধু সবাই গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে আছে অতিথি কক্ষের প্রবেশ পথের দিকে। সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে উর্বশীর।

উর্বশী প্রতিদিনের মতো আজও এই মাত্র পুষ্পনির্যাস-নিসিক্ত জলে গাত্র মার্জনা করে, এসেছে নিপুণিকার কাছে। নিপুণিকা স্বর্ণমুকুর নিয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রতিদিন সে উর্বশীর কবরী রচনা করে দেয়। আর আর পরিচারিকারা কেউ নিয়ে এসেছে ফুলহার, কেউ চন্দন, কেউ অলক্ত। রূপাভিমানিনী উর্বশী, তার প্রসাধনে এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় নেই।

উর্বশী এসেছে, কিন্তু আজ একটু অন্যমনস্ক সে। তার বস্ত্রাঞ্চল বক্ষদেশ থেকে স্খলিত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই তার। এক পরিচারিকা লুটিয়ে পড়া বস্ত্রাঞ্চল তুলে নিয়ে বললে, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন দেবী!

উর্বশী বললে, আমার আবার কিসের চিন্তা—তুই চোখে ভুল দেখছিস। আমার কোনো চিন্তা নেই।

—হয়তো তাই। পরিচারিকা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না—কক্ষের বাইরে ময়ূরীটি আচমকা তারস্বরে চিৎকার করে উঠতে সে চুপ করে গেল।

—দ্যাখ তো বাইরে কে?

নিপুণিকা উঠে গেল। দ্বার উন্মুক্ত করে দেখলো কঞ্চুকী কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি এখানে কেন ? নিপুণিকা বললে।

—দেবীকে একটা কথা নিবেদন করতে এসেছি। কারো দেখা না পেয়ে ময়ূরীর পুচ্ছ আকর্ষণ করেছি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে।

—দেবী এখন প্রসাধনে ব্যস্ত।

—তা হোক, তুমি তোমাদের প্রিয় রানীকে গিয়ে বলো, রাজর্ষি আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি অন্তরাল থেকে রাজর্ষির কথা নিবেদন করেই চলে যাবো।

পরিচারিকা এলো উর্বশীর কাছে। বললে, মহারাজের নির্দেশে কঞ্চুকী এখানে এসেছে—সে অন্তরাল থেকে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চায়।

উর্বশী বেশ-বাস সম্বৃত করে পর্দার অন্তরালে এসে দাঁড়ালো। বললে, বলো কঞ্চুকী—কি বলবে।

কঞ্চুকী রাজর্ষির কথা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর দেহে কম্পন জাগলো। কোনো মতে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

পরিচারিকারা ছুটে এলো। না জানি হঠাৎ কী হলো রানীর।

নিপুণিকা বললে, দেবী কি কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন ?

উর্বশীর মুখে হাসি ফুটলো। সে হাসি যেমন করুণ, তেমনি মধুর। বললে, আর প্রয়োজন নেই প্রসাধনের—আমি অতিথি কক্ষে যাচ্ছি।

নিপুণিকা বললে, কিন্তু এ অবস্থায় গেলে রাজর্ষি যদি ক্ষুব্ধ হন।

উর্বশী বললে, ভয় নেই—তোদের কেউ তিরস্কার করবে না।

ব্যস্তভাবে উর্বশী অলিন্দ অতিক্রম করে সোপান পথে নেমে গেল নিচে। নিপুণিকা সহ আর আর পরিচারিকারা উর্বশীকে অনুসরণ করলো।

উন্মাদিনীর ন্যায় অতিথি কক্ষে প্রবেশ করলো উর্বশী। রাজর্ষি অবাক হলেন উর্বশীকে দেখে। অবিন্যস্ত তার কেশরাশি, তারপর বস্ত্রাঞ্চল ভূলুণ্ঠিত। উর্বশীকে এখন উন্মাদিনীর মতো মনে হচ্ছে।

—উর্বশী !

রাজর্ষির ডাক কানে গেল না উর্বশীর। তার দৃষ্টি তখন কুমার আয়ু আর সত্যবতীর ওপর নিবদ্ধ।

—উর্বশী ! রাজর্ষি এগিয়ে এলেন উর্বশীর কাছে। বললেন, উর্বশী, তুমি এ বেশে কেন ? যাও—অন্তঃপুরে যাও, ভুলে যেয়ো না তুমি রানী।

—রাজর্ষি, অনেক তো সেজেছি, আর নাই-বা সাজলাম। কি হবে রূপসজ্জায়, কি হবে প্রসাধনে। উর্বশী এবারে সমাগত রাজ-সুহৃদবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

—উর্বশী তোমার চিত্ত এখন অস্থির। পুরূরবা বললেন, যাও—তুমি অন্তঃপুরে যাও।

—তুমিই তো কঞ্চুকীকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালে রাজর্ষি। উর্বশী বললে, আর আমার চিত্তের অস্থিরতার কথা বলছো, সত্যিই হয়তো আমার চিত্ত অস্থির, কিন্তু আমার দৃষ্টি, আমার বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়নি।

উর্বশীর এ আচরণে রাজর্ষি কেমন সংকুচিত হয়ে পড়লেন।

শুধু রাজর্ষি নয়, উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে অভিভূত।

এবারে আশ্রমিকা সত্যবতীর কাছে গেল উর্বশী। বিনীতকণ্ঠে বললে, মহর্ষিকে আমার প্রণাম জানাবেন দেবী। আর আপনিও আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

আশ্রমিকা সত্যবতী বললেন, কন্যা উর্বশী—আমি তোমার পুত্র আয়ুকে তোমার হাতে প্রত্যর্পণ করতে এসেছি। মাতৃক্রোড় বঞ্চিত কুমারকে তুমি গ্রহণ করো। আমি দায়মুক্ত হয়ে আশ্রমে ফিরে যাই।

কুমার আয়ু চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে এতদিন পর্যন্ত সত্যবতীকে মা বলে জেনে এসেছে, সেই মা আজ তাকে এখানে রেখে আশ্রমে ফিরে যাবেন, এ কথা সে কিছুতে মেনে নিতে পারে না। আকুল হয়ে বললে, মা—আমিও তোমার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যাবো।

সত্যবতী বললেন, কুমার তোমার যোগ্য স্থান আশ্রম নয়—রাজ-সিংহাসন। যাও—আমাকে ত্যাগ করে তুমি তোমার মাতৃ-সন্নিধানে যাও। মাতা-পুত্রের মিলন প্রত্যক্ষ করে আমি আশ্রমে ফিরে যাই।

কুমার আয়ু তখনো সত্যবতীর স্কন্ধ-দেশে মস্তক স্থাপন করে আছে। তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু ভারাক্রান্ত।

সত্যবতী বললেন, তোমার পুত্রকে গ্রহণ করো উর্বশী। উর্বশী ধীর পদে অগ্রসর হলো। কুমার আয়ুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো।

পুত্রের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে উর্বশী অমন আকুল হয়ে কাঁদছে কেন! এ

তো পরম আনন্দের মুহূর্ত।

শুধু পুরূরবা নয়, উপস্থিত সকলেই বিস্মিত।

সত্যবতীর দু চোখও অশ্রুসিক্ত। কুমার আয়ুর গণ্ডদেশ সস্নেহে স্পর্শ করে বললেন, মাকে সান্ত্বনা দাও বৎস।

কুমার আয়ু এবারে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো, মা!

উর্বশীর সর্বাঙ্গ বারবার শিহরিত হলো। 'আমার পুত্র আয়ু'—বলে মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো।

বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো লুটিয়ে আছে উর্বশীর কুন্দ-শুভ্র কোমল তনু।

পুরূরবা এগিয়ে গেলেন। মূর্চ্ছিতা উর্বশীকে বার বার ডাকতে লাগলেন, কিন্তু উর্বশী সাড়া দেওয়া দূরে থাক, চোখ মেলে তাকালো না পর্যন্ত।

সত্যবতী বললেন, চিন্তিত হবেন না রাজর্ষি, মানসিক উত্তেজনার ফলে সাময়িক ভাবে মাতা উর্বশী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কুমার আয়ুর মাতৃ সম্বোধনে উর্বশীর এই আচ্ছন্নভাব, আমি আশা করি আবার কুমারের সম্বোধনেই ওর চেতনা ফিরে আসবে। কুমার, যাও—তোমার মাকে ডাকো।

কুমার আয়ু উর্বশীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে 'মা মা' বলে ডাকতে লাগলো। কয়েকটি মুহূর্ত, উর্বশী আবার চোখ মেলে তাকালো। তারপর বারকয়েক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শিথিল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু উর্বশী এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি। এখনো তার চোখে মুখে বিহ্বলতা।

সত্যবতী বললেন, এবারে আমি যাচ্ছি উর্বশী।

উর্বশী বললে, আপনি আমার পরম পূজনীয়া। কুমার আয়ু এতদিন আপনাকে মাতৃজ্ঞান করে এসেছে, আমি আপনার কাছে একটি প্রার্থনাই করবো, কুমার যেন কোনোদিন আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

সত্যবতী বললেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে উর্বশী।

উর্বশী এবারে সস্নেহে কুমার আয়ুকে চুম্বন দান করে বলতে লাগলো, শুধু রাজর্ষি নয়, পূজনীয় রাজ-সুহৃদবৃন্দও এখানে উপস্থিত, সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলছি,কুমার আয়ু আমার গর্ভজাত সন্তান,রাজর্ষি এঁর পিতা।

আনন্দসূচক ধ্বনি উঠলো নানা কণ্ঠে। রাজর্ষি পুরূরবা অপুত্রক বলে

এতদিন প্রতিটি রাজ্যবাসীর মনে আক্ষেপ ছিল, এখন তা বিদূরিত হয়েছে। তাছাড়া উপস্থিত সকলেই দিব্যকান্তি কুমার আয়ুকে দেখে মুগ্ধ – সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারীই বটে।

কিন্তু পুরূরবা কিছুতেই সহজ হতে পারছেন না, কুমার আয়ুকে দেখার মুহূর্ত থেকেই তাঁর হৃদয় বাৎসল্য রসে দ্রবীভূত হয়েছে, কিন্তু মন থেকে প্রশ্ন চিহ্নটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছেন না। এখনো ভাবছেন, এর নেপথ্য রহস্য কী ?

উর্বশী বোধহয় স্বামীর মনের কথা অনুমান করেছে। বললে, রাজর্ষি— আমার কথা এক বিন্দু মিথ্যা নয়—কিন্তু সত্য প্রকাশের উপযুক্ত স্থান এই অতিথি কক্ষ নয়। আমি অচিরেই মহারাজের কাছে সব কথা প্রকাশ করবো। কোনো সত্যই আমি গোপন রাখবো না। সুতরাং রাজর্ষি এখন স্বচ্ছন্দে কুমারকে পুত্র স্নেহে আলিঙ্গন করে উপস্থিত পূজনীয়বৃন্দকে উৎসাহিত করতে পারেন।

পুরূরবা এবারে কুমার আয়ুকে সস্নেহে বক্ষদেশে গ্রহণ করে বললেন, আজ আমার হৃদয় পরিপূর্ণ।

পুরূরবার চক্ষুদ্বয় এখন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ।

সমবেত সুহৃদগণ সোল্লাসে কুমার আয়ুর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীরা অতিথি কক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছে, তারা শঙ্খধ্বনি দিয়ে রাজপ্রাসাদ মুখর করে তুলছে।

পুরূরবা দেখছেন, এই আনন্দের মুহূর্তেও উর্বশীর চোখে মুখে বিষাদের কালো ছায়া ঘনীভূত। সে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে – যেন বিষাদ প্রতিমা।

দেবী ঔশীনরী কখনো অতিথি-কক্ষে আসেননি, আজই এলেন। নিপুণিকাই তাঁকে শুভ-সংবাদ জানিয়ে এসেছে।

দেবী ঔশীনরীকে দেখে উর্বশীর চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেবীর চরণ স্পর্শ করে সে বললে, দেবী—কুমার আয়ু আজ থেকে আপনারই পুত্র। আমি ওকে গর্ভে ধারণ করেছি মাত্র ; কিন্তু হতভাগ্য কুমার কখনো মাতৃসুধা পান করেনি, আপনি ওকে গ্রহণ করে আমাকে চিন্তা মুক্ত করুন।

— তুমি কি উন্মাদিনী! ঔশীনরী বললেন, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

—কেন, আমি তো কোনো দুর্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিনি দেবী।

— জানি, কিন্তু এখন এ অভিমান তোমার সাজে না। ঔশীনরী বললেন, চন্দ্রবংশের মুখ তুমি উজ্জ্বল করেছো। আজ তো তোমার গৌরবের দিন।

— না দেবী না, আজ আমার চরম দুঃখের দিন, বলে উর্বশী দ্রুত পদক্ষেপে অতিথি-কক্ষ ত্যাগ করলো।

উপস্থিত সকলে এই মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক। শুধু আশ্রমিকা সত্যবতী, 'সকলের শুভ হোক' বলে রাজর্ষি এবং দেবী ঔশীনরীকে অভিবাদন জানিয়ে অতিথি-কক্ষ ত্যাগ করলেন।

প্রাসাদের কোথাও উর্বশীকে দেখতে পেলেন না পুরূরবা। নিমেষের মধ্যে কোথায় গেল উর্বশী!

শেষটা এলেন প্রমোদ উদ্যানে। উদ্যানেও উর্বশী নেই।

পুরূরবা মনে মনে বিচলিত হলেন, এর মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করলো অভিমানিনী উর্বশী।

চিন্তিত মনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পুরূরবা এলেন দীর্ঘিকার দক্ষিণ কোণে, যেখানে লতা বিতানের নিচে সুন্দর একটি মঞ্চ।

দেখলেন উর্বশী সেই মঞ্চের একান্তে বসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করছে।

—উর্বশী!

—রাজর্ষি!

—কাঁদছো কেন উর্বশী? এমন সুখের দিনে কেউ চোখের জল ফেলে? শুধু তোমার আমার নয়, চন্দ্রবংশের আজ সুখের দিন।

—সুখের দিন!

—সুখের দিন বৈকি! পুরূরবা বললেন, কুমার আয়ুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তার হাতে রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করে আমরা দু জনে চলে যাবো কোনো রমণীয় পার্বত্য উপত্যকায়। যেখানে আমরা নতুন এক প্রেমের স্বর্গ রচনা করবো।

—আর প্রেম! উর্বশী বললে, এখন আর আমাকে নিয়ে প্রেমের স্বপ্ন

দেখো না স্বামী।

—কি বলছো তুমি ?

—যা বলছি এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

—উর্বশী !

—ইন্দ্রবাক্য কখনো মিথ্যা হয় না স্বামী।

—কি বলছো তুমি ! কী বলেছেন দেবরাজ ইন্দ্র ?

—আমাকে স্বর্গলোকে ফিরে যেতে হবে। শুধু যাওয়ার আগে সেই নির্মম সত্যটি তোমাকে জানিয়ে যেতে চাই।

পুরূরবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। হঠাৎ চমকিত হলেন আকাশপথে রথের শব্দ শুনে।

আকাশ এখন তারকাখচিত। পুরূরবা দেখলেন, একটা উজ্জ্বল বিদ্যুৎ শিখা যেন আকাশ পথে নেমে আসছে।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই উর্বশী বললে, দেখার কিছু নেই। দেবরাজ প্রেরিত রথ আসছে। আমার বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। আমাকে স্বর্গলোকে ফিরে যেতে হবে।

—উর্বশী !

—বলেছি তো ইন্দ্রবাক্য কোনোদিন মিথ্যা হয় না। এবারে শোনো, ইন্দ্রের সেই আশীর্বাদের কথা। আমার কথায় বাধা দিয়ো না, আমাকে বলতে দাও।

আচার্য ভরতের অভিশাপের কথা আগেই ব্যক্ত করেছে উর্বশী, কিন্তু ইন্দ্রের কথা কোনোদিন ভুল করেও উচ্চারণ করেনি। স্বর্গভ্রষ্টা উর্বশীকে দেবরাজ আশীর্বাদ করেছিলেন, পুরূরবার ঔরসে উর্বশী সন্তানসম্ভবা হবে। এবং পুরূরবা যেদিন উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের মুখদর্শন করবে, সেদিন উর্বশীকে মর্তলোক থেকে বিদায় নিতে হবে।

উর্বশী দেবরাজের সেই আশীর্বাদের কথা ব্যক্ত করলো।

পুরূরবার দু চোখে অন্ধকার নেমে এলো। বললেন, এই ভয়ংকর আশীর্বাদের কথা তুমি আগে বলোনি কেন ? কেন তুমি এই নির্মম সত্য গোপন করেছিলে ?

—পাছে তুমি মিলন-আনন্দে বঞ্চিত হও। উর্বশী বললে, না বললেও তুমি তো জানো, মিলনের চরম আনন্দ-সুখ থেকে তোমাকে বারবার আমি বঞ্চিত করতে চেয়েছি। করেছিও। তার জন্য তুমি আমাকে কতদিন কত কথা বলেছো। কিন্তু যেদিন গন্ধমাদন থেকে আকাশ রথে প্রত্যাবর্তনকালে আমরা রমণ-ক্রীড়ায় মত্ত হই, সেদিন আমিও আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। তার পরই আমার মধ্যে মাতৃত্বের লক্ষণ স্পষ্ট হয়—কিন্তু তোমার কাছে সে কথাও গোপন রেখেছিলাম। তাইতো অকালে সন্তান প্রসব করে রাতের অন্ধকারে সদ্যোজাত পুত্রকে রেখে এসেছিলাম মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর কাছে।

—কিন্তু কেন?

—এর পরেও কেন! বলেছি তো ইন্দ্রের সেই আশীর্বাদের কথা, যা আচার্যের অভিশাপের চেয়েও ভয়ংকর। স্বামী, আমি শুধু আত্মসুখের জন্য মহাপাপ করেছি।

—পাপ!

—পাপ বৈকি। সদ্যোজাত সন্তান, যে নিতান্ত অজ্ঞান-অবোধ, তাকে রেখে এসেছি একটি আশ্রমে। জীবনে একটি দিনের জন্য যে মাতৃস্তন পান করেনি, যে একদিনের জন্য মাতৃস্নেহ পায়নি। স্বামী—এর পরেও বলবে কিসের পাপ? আমি শুধু দিন রাত তোমাকে নিয়ে মত্ত থাকতে চেয়েছি।

পুরূরবা বললেন, ভুলে যাও পুরানো কথা। আমাদের সামনে এখন নতুন জীবন, নতুন পথ।

উর্বশী বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো। বললে, স্বামী—তুমি কি এখনো নির্মম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারছো না? আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎপ্রভা সমন্বিত রথ নেমে আসছে। ওই রথ আসছে আমার জন্যে। আমার মর্তলীলার দিন শেষ—আর ক্ষণকাল মাত্র। তারপর আবার ফিরে যেতে হবে সেই পুরাতন স্বর্গলোকে।

—উর্বশী!

—আর অমন করে আমার নাম ধরে ডেকো না। তুমি ভুলে যাও তোমার উর্বশীকে। রাজর্ষি, তোমাকে একটি অনুরোধ—

কথা শেষ করলো না উর্বশী।

পুরূরবা বললেন, চুপ করলে কেন উর্বশী!

উর্বশী তবুও নিরুত্তর।

পুরূরবা এবারে উর্বশীর চিবুক স্পর্শ করে তার রক্তিম অধরে চুম্বন দিতে গেলেন, কিন্তু উর্বশী দূরে সরে গেল।

পুরূরবা রীতিমত বিস্মিত এবং ব্যথিত। ফিরে তাকালেন উর্বশীর মুখের দিকে। কোথায় গেল উর্বশীর সেই স্নিগ্ধ রূপ, কোথায় গেল তার মোহিনী হাসি। উর্বশীর মুখের কোমল রেখাগুলিও কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে যেন।

এদিকে রথ আকাশপথে আরো নেমে এসেছে। ক্ষণকাল বাদেই অবতরণ করবে মর্তের মাটিতে।

পুরূরবা বললেন, তোমাকে আমি স্বর্গপুরে যেতে দেব না উর্বশী।

উর্বশী হেসে উঠলো। বললে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। এ নিয়তির নির্মম বিধান। উর্বশীকে তুমি ভুলে যাও।

পুরূরবা বললেন, প্রিয় উর্বশী—আমি জানতাম না তুমি এমন অকরুণ হয়ে উঠতে পারো। আমার কোনো কথা কি তুমি শুনতে চাওনা—তুমি শুধু স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবছো?

—আর কী হবে কথা বলে। সব কথাই তো এখন অর্থহীন।

—একবার কাছে এসো উর্বশী।

—না।

—তুমি তো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না, তোমার কোমল তনুর মধ্যে যে কোমল মন ছিল, কোথায় গেল তোমার সেই সুন্দর মন?

—ভুলে যেয়ো না আমার সত্য পরিচয়। আমি নৃত্যগীত-অভিনয় পটিয়সী স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশী, আমাদের মন কখনো আলোয় কখনো অন্ধকারে। ঊষা যেমন আসে, তেমনি আমিও এসেছিলাম তোমার জীবনে। মনে রেখো, ঊষাকাল কখনো স্থায়ী হয় না।

—কি বলছো তুমি!

—আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। শোনো, বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তেমনি আমাকেও তুমি ধারণ করতে পারবে না। বায়ুর স্পর্শ সুখ

উপভোগ করা যায় মাত্র। তুমিও আমাকে উপভোগ করেছো—এরপর আর কিছু আশা কোরো না।

পুরূরবা মনে মনে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছেন। উর্বশীর আচরণ, উর্বশীর কথা তাঁকে বিস্মিত করেছে। তবুও আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, তোমাকে ভালোবেসে আমি অন্ধ হয়েছিলাম। তুমি কি জানো না, তোমাকে ছাড়া এতদিন আর কারো কথা, কোনো কিছুর কথা চিন্তা করিনি। আমি রাজ্য-চিন্তা ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, দেবী ঔশীনরীর মতো রানীকেও আমি অবহেলা করেছি, আমি রণনিপুণ রাজা—অথচ সেই রণনীতি পর্যন্ত আমি বিস্মৃত হয়েছি। সবই তো তোমার জন্যে।

—জানি রাজর্ষি। উর্বশী বললে, তোমার প্রেম আমাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে। তুমি আমাকে অশেষ সুখ দিয়েছো, যে সুখ আমি স্বর্গেও পাইনি। ইন্দ্র যা দিতে পারেননি, তুমি তাই দিয়েছো।

—আমার অন্তঃপুরে শুধু দেবী ঔশীনরীই নয়, সুজুর্ণি, শ্রেণী, সুম্ন, আপি ও গ্রন্থিণীর মতো যৌবনবতী তন্বীরাও ছিল, একদিন যারা আমার মনোবিলাস চরিতার্থ করেছে—তোমার জন্যে আমি তাদেরকেও অবহেলা করেছি। আমি পুরূরবা—তোমাকে ছাড়া এতদিন যে আর কারো জন্যে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত রাখিনি।

—রাজর্ষি, তুমি আত্মপ্রশস্তি নাই-বা করলে। আমি জানি তুমি কে। আমি জানি, তোমার জন্মলগ্নে স্বর্গের দেবীরা তোমাকে দেখতে এসেছিলেন, সতত প্রবহমান নদীও তোমার জন্মমুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে তোমাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। আর পরবর্তী কালে দেখেছি, তোমার শৌর্য-বীর্যে স্বর্গেব দেবতারাও মুগ্ধ। তুমি দৈত্য-দানব সংহার করেছো, সে কথা তো ইতিহাস হয়ে আছে। রাজর্ষি, তোমার তুলনা তুমি নিজে। তোমাকে পতিরূপে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

—কিন্তু আজ?

উর্বশীর মুখে হাসি ঝংকৃত হলো। বললে, প্রিয় রাজর্ষি—আমি কি কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে। তুমি মর্তবাসী—আমি স্বর্গ অপ্সরা হয়েও

তোমার বীর্যকে ধারণ করেছি, তারই ফলশ্রুতি কুমার আয়ু। অথচ আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কথা মনে রেখে কখনো সন্তান কামনা করিনি—পাছে তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে।

পুরূরবা ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। ওদিকে আকাশরথ আরো নিকটবর্তী হয়েছে। উর্বশী ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠছে।

পুরূরবা বললেন, পুত্র গৌরবে আমি ধন্য উর্বশী। তুমি চন্দ্রবংশকে রক্ষা করেছো—এর জন্যে ঊর্ধ্বলোক থেকে আমার পূর্বপুরুষরাও তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু আজ আমার কাছে সে সব আনন্দ ম্লান হয়ে যাবে। তোমার বিরহ যে আমি সহ্য করতে পারবো না।

উর্বশী বললে, রাজর্ষি—তোমার অপেক্ষায় রয়েছে কুমার আয়ু, যাও—তার কাছে যাও। ভুলে যাও উর্বশীকে।

আসন্ন বিরহ-বেদনার কথা চিন্তা করে পুরূরবা কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর তাঁর দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। বিলম্বিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, উর্বশী—নিশ্চিত মৃত্যুর পথে তুমি আমায় এগিয়ে দিচ্ছো। আমি জানি, এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র আশ্রয়।

—রাজর্ষি! উর্বশী বললে, তুমি কি উন্মাদ হয়েছো?

—তুমি যা খুশি আমাকে বলো। পুরূরবা বললেন, আমি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবো না, চলে যাবো লোকচক্ষুর অগোচরে, সেখানে মৃত্যুকে আশ্রয় করবো। জানি, আমার এই নশ্বর দেহ পড়ে থাকবে কোনো নির্জন অরণ্যে কিংবা গিরি কন্দরে, যেখানে বৃকেরা আমার এই রাজদেহটা সানন্দে ভক্ষণ করবে।

উর্বশী মিনতি জানিয়ে বললে, রাজর্ষি তুমি এ ভাবে মৃত্যু কামনা কোরো না। তুমি তো কাপুরুষ নও, তুমি বীর, তুমি রাজা—তাছাড়া তুমি বীর পুত্রের পিতা।

—উর্বশী! তোমার মুখে এখন একথা মানায় না।

—রাজর্ষি, একজন স্বর্গবারাঙ্গনার বিরহ তুমি সহ্য করতে পারবে না! উর্বশী বললে, ধিক তোমাকে। তুমি রমণীর প্রেমে এমনই আচ্ছন্ন যে, বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো। তবে শোনো, রমণীর প্রণয় কখনো স্থায়ী হয় না।

পদ্মপাতায় জলের মতো রমণীর প্রেম।

পুরূরবা চাপা চিৎকার করে উঠলেন, তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? উর্বশী আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—তুমি কি হৃদয়হীনা?

—তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারো রাজর্ষি, কোনো ক্ষতি নেই। উর্বশী বললে, তবে আমি হৃদয়হীনা নই।

—তবে এসো, আমাকে তোমার কোমল বাহুলতায় বেষ্টন করো। আমাকে আনন্দ দাও।

—না। উর্বশী বললে, রমণীর হৃদয় আছে—কিন্তু সে হৃদয় তুর্দান্ত বৃকের হৃদয়।

—উর্বশী। পুরূরবা বললেন, এই কি তোমার স্বরূপ!

—তোমার প্রেমের আকর্ষণে আমি স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর ফিরে যাচ্ছি তোমার ঘৃণা নিয়ে। কামনা-সর্বস্ব স্বর্গবাসীর সঙ্গে মর্তের মানুষের মধ্যে কি এতটুকু তফাৎ নেই, আশ্চর্য! বলে উর্বশী আকাশের দিকে তাকালো।

স্বর্গের রথ এখন মৃত্তিকা স্পর্শের অপেক্ষায়।

উদ্যানের একান্তে রথ ভূমি স্পর্শ করলো।

বিদ্যুৎ-প্রভা সমন্বিত দেবরাজ ইন্দ্রের রথ।

উর্বশী একবার পুরূরবার দিকে দৃষ্টিপাত করলো। বললে, বিদায়ের মুহূর্তে তোমার নিবিড় প্রেমের স্পর্শ চাই স্বামী।

পুরূরবা বিচলিত হলেন। উর্বশীকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বক্ষদেশে গ্রহণ করে বললেন, তুমি যেয়োনা—তোমার বিরহ তাপে আমাকে দগ্ধ কোরো না।

উর্বশী একটি হাত পুরূরবার হৃদয়-দেশে স্থাপন করে বললে, স্বামী—এতক্ষণ কি বলেছি ভুলে যেয়ো। আমাকে যেতেই হবে স্বর্গলোকে। তবে একটা কথা বলে যাই ইলাপুত্র—তুমি স্বর্গের সুহৃদ, দেবগণ নিয়ত তোমার মঙ্গল কামনা করেন। তুমি সুখী হবে।

পুরূরবা বললেন, আকাশপ্রিয়া উর্বশী—তোমার আলিঙ্গন-স্পর্শে এখন আমার হৃদয় শান্ত হয়েছে। তবুও-শেষবারের মতো মিনতি জানিয়ে বলছি,

তুমি আবার ফিরে এসো।

আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে উর্বশী বললে, রাজর্ষি তুমিই বরং তোমার ইচ্ছামতো স্বর্গের নন্দন কাননে এসে আনন্দ-উৎসবে মিলিত হয়ো।

—উর্বশী!

—রাজর্ষি, আমি নন্দনকাননে তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। আর প্রার্থনা করবো পুত্র আয়ুর জন্য—সে যেন চন্দ্রবংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। তুমি আমার হৃদয়ের অঞ্জলি গ্রহণ করো স্বামী।

রাজর্ষির মুখে এখন কোনো কথা নেই। মনও এখন শান্ত। ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়ে যায়—তেমনি। শুধু তাঁর দুটি চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত।

উর্বশী মিনতি জানিয়ে বললে, আমাকে বিদায় দাও স্বামী।

পুরূরবা তবুও নীরব।

উর্বশী এবারে অনুনয় জানিয়ে বললে, বিদায়ের মুহূর্তে তোমার মুখে হাসি দেখতে ইচ্ছে করছে।

যদিও চোখে জল, তবু পুরূরবা মুখে হাসি ফোটালেন।

উর্বশী বললে, তোমার আমার এ প্রেমের মৃত্যু নেই রাজর্ষি। আমি চললাম।

পুরূরবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উর্বশী রথের দিকে অগ্রসর হলো। তখনো স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন পুরূরবা।

উর্বশী রথে আরোহণ করলো। রথ ধীরে ধীরে আকাশে উড্ডীন হলো।

পুরূরবা অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা সমন্বিত স্বর্গরথ দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

স্বর্গ অপ্সরা ফিরে গেল স্বর্গলোকে।